পরিবেশ, করোনা এবং মার্কস প্রসঙ্গ

বিশেষ ডিজিটাল সংস্করণ

জুন ২০২০

গল্প কবিতা বই

৫৫বর্ষ ● ষষ্ঠ সংখ্যা ● জুন ২০২০

পরিবেশ, করোনা এবং মার্কস প্রসঙ্গ

বাসব বসাক ৬
গুজবের গেরোয় করোনা অতিমারি সৌম্যকান্তি জানা ১৯
মারী ও মড়ক কলকাতার মহামারীর ইতিকথা সপ্তর্ষি চৌধুরী ২৯
অন্ধকারে বন্ধঘরে থাকবো না তপন মিশ্র ৪০

প্রবন্ধ

শ্রমিকের ঘরে হাহাকার রাহুল মজুমদার ৬২
ওয়ার্লি উপজাতি বিদ্রোহ ১৯৪৫-৪৬ মানবেশ চৌধুরী ৮৫

স্মরণ

দেবেশ রায় ও বাংলা উপন্যাসের দায় শুভময় ৯১

গল্প

তেংনাদা কথা সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫
আকাশ আংশিক মেঘলা হিমি মিত্র রায় ৮০

কবিতাগুচ্ছ কামরুজ্জামান ৫৬

কবিতা

ব্রততী ঘোষরায় অপূর্ব নায়েক দেবানন্দ ভট্টাচার্য
বিরূপাক্ষ পণ্ডা তৈমুর খান ৭৭

বই রাহুল চট্টোপাধ্যায় অনিকেত মহাপাত্র ৯৭

প্রচ্ছদ : দেবাশিস মিত্র

সম্পাদক : অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী কর্তৃক ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।
ফোন : ২২১৭ ৬৬৩৩-৪০, ফ্যাক্স : ২২২৬৩৭৮৮ Web : www.nandanpatrika.com

সম্পাদকীয়

পৃথিবীব্যাপী মহামড়কের মধ্যে আত্মরক্ষার সমস্ত রণকৌশল ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে আমেরিকা, ব্রাজিল, ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, ভারত, ইতালি প্রভৃতি দেশে। একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই। পাশাপাশি এটাও দেখা যাচ্ছে চীন ও কিউবা তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েও এখনও করোনা মোকাবিলায় অনেকটাই বেশি সাফল্য পেয়েছে। কিউবার চিকিৎসকরা ইতালির আক্রমণে সাড়া দিয়ে সেই দেশে গিয়ে নিজেদের পদ্ধতির সফল প্রয়োগ ঘাতে পেরেছেন এবং ইতালিবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পুরোপুরি সামাজিক দায়িত্বভুক্ত বলে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে ব্যাধির প্রতিকারের সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা আছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশ হোক বা না হোক, যেখানেই পরিকল্পিত গণব্যবস্থা উপস্থিত, সেইসব দেশে লক্ষ্যণীয় সুফল পাওয়া গেছে; যথা আলজিরিয়া, মরক্কো, কিনিয়া, তানজানিয়া, লাওস, কামবোডিয়া। শোষোক্ত দুই দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা শূন্য। তাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভিয়েতনাম, সেখানেও করোনায় কারো মৃত্যু হয়নি। এইসব দেশে মানুষ বেসরকারি বহুমূল্য চিকিৎসার থেকে বেশি নির্ভর করছেন বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যের করোনা চিকিৎকার উপর। সেই কারণে তাঁরা বহুলাংশে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। কানাডায় করোনার ব্যাপ্তি প্রতিবেশি আমেরিকার তুলনায় অনেক সীমিত। এর প্রধান কারণ হল, কানাডায় প্রাইভেট চিকিৎসা আইনত নিষিদ্ধ, স্বাস্থ্যের দায়িত্ব পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্র মারী প্রতিরোধের পরিকল্পনা নিয়ে প্রস্তুত।

এই পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং শৃঙ্খলার চিকিৎসা ব্যবস্থাই কেরালাকে ভারতের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে পৃথক রেখেছে। কেরালা এক গৌরবোজ্জ্বল একক অবস্থানের অধিকারী; দেশে-বিদেশে প্রশংসিত ও বহু আলোচিত।

ভারতে সর্বত্রই স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যাপক সরকারি উপস্থিতি ছিল এবং দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষ প্রধানত সরকারি হাসপাতালের উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু গত তিরিশ বছরে ভারত নয়া-উদারনীতির পথে

হোঁচট খেতে খেতে হাঁটতে শুরু করেছে; ফলে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকে বহুমূল্যে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে ক্রমশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তি পুঁজির হাতে। যেটুকু সরকারি ব্যবস্থা নিতান্ত অবহেলার মধ্যে টিঁকে আছে, তাই দরিদ্র্যের অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ মানুষের একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে বাজের বিনিয়োগ ক্রমাগত কমেছে বলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ওষুধ ও সরঞ্জামের অভাব সুপ্রকট। করোনার হাত থেকে নিস্তার পাবার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল মানুষের লালারস পরীক্ষা। যত বেশি মানুষকে পরীক্ষা করা যাবে, তত সংক্রমণের পরিধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাবে ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও রসদ সংগ্রহ করা যাবে। বাস্তব চিত্র কী? হাজার হাজার লালারসের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে; কিন্তু পরীক্ষার সরঞ্জাম সরকারি প্রতিষ্ঠানে নেই বলে নমুনাগুলি অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে। মানুষ অসহায়।

সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাঁরা প্রথম সারির সৈনিক, তাঁরা হলেন ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁদের পর্যন্ত যথেষ্ট নিরাপত্তা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তাঁরা পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিচ্ছেন। কেউই কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান ছাড়েননি। জানি না কোন সুদূর ইতিহাসে এই বীরত্বের কাহিনী লেখা হবে বা নিকট কর্তমানে এই আত্মদানের কোনো ক্ষতিপূরণ আমাদের দেশ জোগাতে পারবে কিনা।

করোয়ার বিরুদ্ধে মানুষের দুনিয়াজোড়া লড়াই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে দু ধরনের সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্য। একদিকে সমাজতন্ত্র, যা সমাজের সকলের দায়িত্ব নিতে রাজি। অন্যদিকে পুঁজিবাদ, যেখানে বৃহৎ পুঁজির হাতে রাষ্ট্র, ফলে অস্বাস্থ্য আর মহামারীর বড় আঘাতটা গিয়ে পড়ে পুঁজিহীন, কর্মহীন, বাস্তুহীন মানুষের ঘাড়ে। দেশে-বিদেশে যাঁরা প্রাণ হারাচ্ছেন, তাঁদের বৃহদাংশ সর্বহারা বা আধা-সর্বহারা মানুষ। ভারতের শ্রমিকদের বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকদের অসহায় অবস্থা এবং তাঁদের প্রতি নির্দয় তাচ্ছিল্য এখন সারা বিশ্বের আলোচনার বস্তু। কিন্তু কারা এই পরিযায়ী শ্রমিক? কেন তাঁরা পরিযায়ী? এঁরা সকলেই ভূমিহীন। কেউ ছিলেন খেতমজুর, কিছু হয়তো কাজ করতেন কারখানায়, অনেকেই দিনের পর দির বেকার থেকে ভিক্ষান্নে বেঁচেছিলেন কোনোমতো। অতএব কাজের সন্ধানে দলে দলে ভিনরাজ্যে। সে কাজ অবস্থায়ীথ, নবড়ে,

আজ আছে তো কাল নেই, এই মরশুমে উপচে পড়ছে পরের মরশুমে তলানিতে ঠেকছে। আর একেই পুঁজিবাদের দালাররা সগর্বে বলে পুঁজিবাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মুখ, ফ্রেনডলি ফেস।

মহামারী-বিশ্বমারীর সময়ে বোঝা যায় ওটা মুখ নয়, মুখোশ; খসে গিয়ে পুঁজির করাল দাঁত বেরিয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার বলে কারো যেন কাজ না যায়; পুঁজিপতি হাসে আর কলা দেখায়, প্রত্যেকটি পরিযায়ী কাজ হারায়, সেইসঙ্গে অন্য শ্রমিকও। কেন্দ্র বলে, যে রাজ্যে তাঁরা আছে, সেই রাজ্য সরকার তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করুক; রাজ্য সরকার বলে, তাঁরা নিজের নিজে ফিরুক, অপরের বোঝা আমার ঘাড়ে কেন?' ফিরবার জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা হয়; তখন কথা ওঠে, রেলভাড়া কে দেবে? সব খোয়ানো মানুষ রেলভাড়া দিতে পারে না, সব সঞ্চয় খুইয়ে গাদাগাদি করে লরিতে বোঝাই হয় ছাগল-ভেড়ার মতো। ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। যে রাজ্য গন্তব্য, সেই রাজ্যও বলে, ওই যে করোনা বয়ে আনছে, ঢুকতে দেব না। এরা যেন ব্যাডমিন্টন খেলার শাটলকক। এ একদিকে পাঠায় তো, সে আরেকদিকে ছুঁড়ে ফেলে। করোনার মুহূর্তে সমাজের নিচুতলার মানুষ অনাহার ছাড়াও অপমান আর নিষ্ঠুরতার নতুন মাত্রার ছোঁয়া পেল।

ফলে বিক্ষোভ আর প্রতিরোধও দেখা দিচ্ছে। শ্রেণিবিদ্বেষের নতুন রূপের জবাব আসছে নতুন ধরনের শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে। করোনার প্রকোপ হয়তো কমে যাবে কয়েকমাস পরে। কিন্তু তাকে অনুসরণ করে যে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হচ্ছে, তা দু-চার মাসে যাবার নয়, এমনকি দু-চার বছরেও নয়। সেই সংকটের প্রতিকারে পুঁজিবাদ অসমর্থ, পরিকল্পনাহীন। অতএব শ্রমিকশ্রেণী তথা অন্যান্য খেটে-খাওয়া মানুষকে প্রস্তুতি নিতে হবে দীর্ঘস্থায়ী ও নতুন রকম শ্রেণি সংগ্রামের জন্য।

প্রবন্ধ

পরিবেশ, করোনা এবং মার্কস প্রসঙ্গ

বাসব বসাক

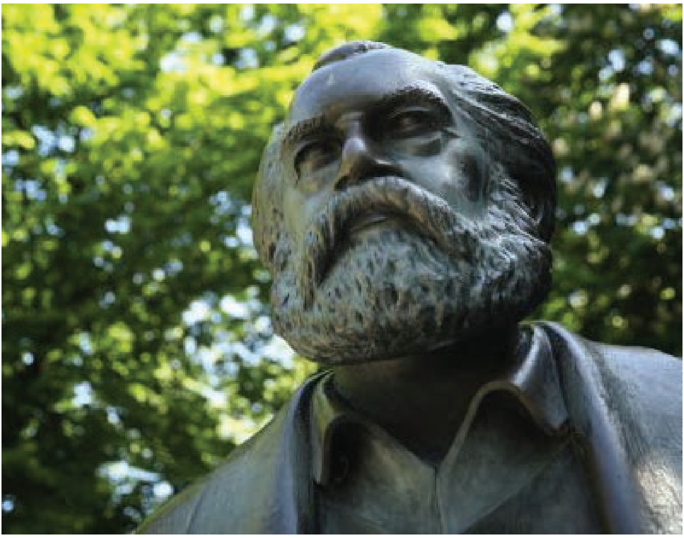

মাত্র এই সেদিন, ২০১৯ এর ১ ডিসেম্বর চিনের উহান প্রদেশে জ্বর আর তীব্র শ্বাসকষ্টের লক্ষণ যুক্ত এক রোগীর শরীরে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাইরাসের উপস্থিতি নজরে আসে চিকিৎসকদের। সেই নবাগত ভাইরাসটি ক্রমে নোভেল করোনা ভাইরাস বা সার্স কোভ-২ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং অত্যন্ত দ্রুততায় মাত্র মাস তিনেকের মধ্যেই আবিশ্ব এক অভূতপূর্ব মহামারীর আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা পৃথিবীতে মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে ছেষট্টি লক্ষের মতো, আর মৃতের সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ ছুঁই ছুঁই; এর মধ্যে আজ পর্যন্ত কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই মারা গেছেন এক লক্ষাধিক

মানুষ। পৃথিবী জুড়ে প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের মিছিল। করোনা কবলিত দুনিয়া আজ সত্যিই 'মহা আশঙ্কা যপিছে মৌন মন্তরে'। অতি ক্ষুদ্র করোনা ভাইরাসের এহেন সংহার মূর্তি ও এমন ব্যাপকতা দেখে বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্রের অবলুপ্তি এবং পারমানবিক অস্ত্রের ধ্বংসলীলা জনিত আশঙ্কার পাশাপাশি করোনা মহামারীকে গণ অবলুপ্তির চতুর্থতম আশঙ্কা হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এহেন উন্নয়নের মধ্যেও দেশে দেশে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা যে এই মহামারী ও তার পরিপ্রেক্ষিতে ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতির অধোগতি রুখতে পুরোদস্তুর ব্যর্থ হয়েছে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উৎপত্তির উৎস সন্ধানে

বিজ্ঞানীদের ধারনা করোনা ভাইরাসের অন্য কোনো একটি জাত (strain) বাদুড় থেকে প্যাঙ্গোলিন জাতীয় কোনো প্রাণীর দেহ হ'য়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করার পথে বিবর্তিত হয়েই এই নোভেল করোনা ভাইরাসের সৃষ্টি। সন্দেহ নেই এ জন্য মানুষের খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যান্য জীবের আবাসভূমিতে মানব সমাজের আধিপত্য বিস্তারের কারণে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সম্পৃক্ততা বহুগুণ বেড়ে যাওয়াই নব্য ভাইরাসটির সৃষ্টির পটভূমি নির্মান ক'রে থাকবে। কিন্তু করোনা সংক্রমণকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহামারী হিসাবে চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গেই, বর্তমানে নিজের দেশে করোনার ভয়াণক আক্রমণ রুখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প নিদান দিয়েছিলেন যেহেতু চিনের উহান প্রদেশে এর জন্ম তাই এই ভাইরাস চিনের দূরভিসন্ধিতে অত্যন্ত গোপনে কোনো চিনা পরীক্ষাগারে তৈরি না হ'য়ে যায় না। তিনি বারবার এই ভাইরাসকে চিনা ভাইরাস বলতে থাকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও শেষ পর্যন্ত তাদের বিরক্তি গোপন করতে পারে নি। ট্রাম্প সাহেবকে এজন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সতর্কও করা হয়। আমাদের দেশেও চরম দক্ষিণপন্থীরা ট্রাম্পের ভাষ্যের অনুরণন তুলতে শুরু করেন সোসাল মিডিয়ায়। তবে ১৭ মার্চ তারিখে প্রখ্যাত নেচার মেডিসিন পত্রিকার ২৬ তম সংখ্যায় (২৬; ৪৫০-৪৫২/২০২০) প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রে ক্রিস্টিয়ান এ্যান্ডারসন, এ্যান্ড্রু রামবাউড এবং রবার্ট এফ গ্যারি

নোভেল করোনা ভাইরাসের জিনোমটির অনুপুঙ্খ পরীক্ষা ক'রে স্পষ্ট ভাষাতে জানিয়ে দেন আর যাই হোক এই নব্য ভাইরাসটি কোনো মতেই কোনো পরীক্ষাগারে তৈরি করা সম্ভব নয়। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, "Our analyses clearly show that SARS CoV-2 is not a laboratory costract or a purposefully manipulated virus"। বরং একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ নিংড়ে মুনাফার পাহাড় গড়তে ব্যস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গর্ভেই এই ধরনের মারক ভাইরাসের জন্ম।

বিবর্তন জীববিদ্যা বিশারদ রব ওয়ালেস ২০১৬ সালে 'Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious Diseases, Agribusiness and the Nature' নামে একটি বই লেখেন, যে বইয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে বিশ্বায়িত কৃষিব্যবসা কি ভাবে হেপাটাইটিস-ই, নিফা ভাইরাস, কিউ ফিভার, সালমোনেল্লা, ইবোলা ইত্যাদি একাধিক রোগজীবাণুর পরিব্যক্তি বা মিউটেশন ঘটিয়ে নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটানোর উপযোগী পরিবেশ তৈরি ক'রে থাকে। সেই রব ওয়ালেশ সম্প্রতি করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করেছেন এহেন মহামারীর আসল কারনটিকে, "Origin and spread of CoViD-18 can be seen as related to the circuits of capital." - কোভিড-১৯ এর সৃষ্টি ও সংক্রমণের ব্যপকতা পুঁজির চক্রের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত। তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার হ'ল সার্স কোভ-২ বা নতুন যে কোনো ধরনের মারক ভাইরাসের উৎপত্তির কারন মুনাফা সর্বস্ব পুঁজিনিবিড় কৃষিব্যবসার সম্প্রসারণ করতে গিয়ে প্রকৃতির রাজ্যে যে ভাবে হানাদারি চলেছে তার ফলে সামগ্রিক ভাবে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয় বা চ্যুতি (Ecological rift) ক্রমশঃ প্রসারিত হ'তে থাকায় আবিশ্ব মহামারী সৃষ্টি করার মত ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন নতুন রোগজীবানুর সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

কার্ল মার্ক্সও মানুষ ও প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ভাঙ্গনকেই যাবতীয় প্রাকৃতিক সমস্যার মূল হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ভূতত্ত্ববিদ জুস্টাস ফন লিবিগের গবেষণা মার্কসকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই তিনি মূলত মাটির বিপাকীয় চ্যুতির ওপরেই আলোকপাত করেছিলেন। মার্কসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুঁজিবাদের উদ্ভবের আগে মানুষ ফসল উৎপাদন করতো হয় নিজের

ও তার পরিবারের জন্য অথবা বড়জোর সে যে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাস করে, সেই এলাকার ক্ষুদ্র একটি জনগোষ্ঠীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। ফলে পুঁজিবাদ পূর্ববর্তী সমাজে মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান সমূহ খাদ্যশস্যের মাধ্যমে যেমন মানব শরীরে আত্তীকৃত হওয়ার সুযোগ ছিল, তেমনই মানুষের মল, মূত্র বা মৃতদেহ থেকে সেইসব উপাদান আবার সেই একই এলাকার মাটিতে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। সেই কারনে জীব-ভূ রাসায়নিক চক্রে ফাটল ধরার বড় একটা সুযোগ ছিল না। তাই মাটির প্রাকৃতিক গুণাবলীও খুব কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে পারতো না। ফলে সেকালে সামগ্রিক ভাবে প্রকৃতিতে একটা ভারসাম্য বজায় ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমদানি ঘটলো উৎপাদনের নতুনতর প্রকরণ (means of production), অর্থাৎ যন্ত্র, যে যন্ত্রের অধিকার কখনোই সার্বজনীন নয়, কেবলমাত্র যন্ত্রমালিকের। কিন্তু শুধু যন্ত্র আর কাঁচামাল থাকলেই তো আর উৎপাদন হয় না; সে জন্য চাই যন্ত্র পরিচালনায় দক্ষ উৎপাদনশীল শক্তি (productive force) অর্থাৎ কিনা শ্রমিক, মার্কসের ভাষায় 'প্রোলেটারিয়েট'। এই শ্রমিক তো আর আকাশ থেকে আসে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের যোগান আসে গ্রাম থেকে। এই ভাবে দলে দলে গ্রামীন মানুষের শহরমুখী স্রোতের ফলে মাটির সঙ্গে মানুষের যে নিবিড় সম্পর্ক, যে মিথস্ক্রিয়া এতদিন জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের আবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ধরে রেখেছিল, সেই চক্রে বড়সর ফাটল ধরা শুরু হয় পুঁজিবাদের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে। অন্যদিকে ভৌগলিক এলাকা কেন্দ্রিক উৎপাদনের পরিবর্তে আরও বেশি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ধাবিত পুঁজিবাদ চায় পুঁজির অবাধ গতি, চায় বিশ্বায়িত বাজার। ফলে চলতে থাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলতে থাকে প্রকৃতি ও পরিবেশের অবাধ লুনঠন। আর এই দুইয়ের চক্করে ক্রমে বেরে চলে প্রকৃতির বিপাকীয় ফাটল, মাটি হারাতে থাকে তার পুষ্টিগুণ। আরও মুনাফার লক্ষ্যে তখন বাড়তে থাকে কৃত্রিম সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ প্রয়োগ, বাড়ে মাটির নিচের জলভান্ডারের নির্মম শোষণ, বাড়ে জীবাশ্ম জ্বালাণির অপরিমিত দহন এবং লাফিয়ে বাড়তে থাকে দূষণের মাত্রা। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষয়। আর সেই ফাঁকেই বাড়তে থাকে আমাদের অসুখ বিসুখও। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পূর্ববর্তী নির্দেশক (২০১৭-১৮)মারিয়া

নেইরার কথায়, ''Human health is strongly linked to the health of the ecosystems which meet many of our most critical needs"। ডারউইন ও হাক্সলের শিষ্য, মার্কসের প্রিয় বন্ধু প্রাণীবিদ রে ল্যাঙ্কেস্টার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বই 'Kingdom of Man' এর 'প্রকৃতির বদলা' ('Nature's revenge') শীর্ষক অধ্যায়ে এক শতাব্দী আগেই স্পষ্ট ভাষায় লিখে গেছেন, "that all modern epidemics could be traced to human modifications of ecological conditions"। মুনাফার লক্ষ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে গিয়ে লোভাতুর মানুষের দ্বারা কি ভাবে বাস্তুতান্ত্রিক অবস্থার এহেন ভয়াণক ক্ষয়িষ্ণু পরিবর্তন ঘটে চলেছে সে ব্যাখ্যাও দ্ব্যর্থহীণ ভাষায় দিয়ে গেছেন ল্যাঙ্কেস্টার, "In his greedy efforts to produce large quantities of animals and plants...man has accumulated unnatural swarmps of species in field and ranch and unnatural crowds of his own kind in towns and forests"। এও তো মার্কসের সেই বিপাকীয় চ্যুতির (metabolic rift) কথাই। যত না প্রাকৃতিক কারনে, তার থেকে ঢের বেশি এই সর্বগ্রাসী দখলদারীত্বের কারনেই তো নতুন নতুন রোগ বালাই, নতুন ব্যাকটেরিয়া, নতুনতর ভাইরাসের উদ্ভব ঘটে চলেছে। ল্যাঙ্কেস্টারের মতে এই সব কিছুর জন্য দায়ী আসলে পুঁজির বহুজাতিক দালালরা; তাঁর কথায় 'Cosmopolitan dealer in finance'। সেদিন অবশ্য কেউ তেমন পাত্তা দেননি এসব কথার। এরপরেও মার্কসবাদী চিন্তাবিদরা বারবার সতর্ক করেছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কি ভাবে বাড়িয়ে তুলেছে মহামারীর আশঙ্কা সেই বিষয়ে। ২০০০ সালে 'Is Capitalism a Disease?' নিবন্ধে রিচার্ড লেভিন রোগ মহামারীর ক্রমবর্ধমান ভ্রুকুটি ('growing threat of disease pandemic') অনুধাবন করার ক্ষেত্রে খামতি থেকে গেছে কারন আমাদের প্রচলিত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৃথিবীর ইতিহাস, অন্যান্য জীবপ্রজাতি, বিবর্তনের ধারা এবং বাস্তুতন্ত্রের দিকে নজর দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে ("conventional public health failed to look at world history, to look at other species, to look at evolution and ecology.")। ফলে বেড়ে চলেছে রোগ-ভোগ-মহামারী; যার প্রত্যক্ষ অভিঘাতে

মারা পড়ছে মানুষ, বিশেষ ক'রে অপুষ্টিতে ভোগা গরীব মানুষ। এঙ্গেলস তাঁর ১৮৪৫ সালে লেখা 'Condition of the working class in England'-এ 'Disease and epidemiological conditions' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একেই বলেছেন সামাজিক হত্যা('social murder')। এই যে আজ করোনার ধাক্কায় আবিশ্ব এত মানুষের মৃত্যু ঘটছে, তার দায় বর্তমান বাজার নির্ভর পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও তার নিয়ামকরা কখনোই এড়াতে পারে না। গত মে মাসে লন্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস্-এর মত পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধেও তাই প্রকাশিত হ'তে দেখা যাচ্ছে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা ক'রে লেখা এমন শাণিত লাইন, 'ভাইরাস নগ্ন ক'রে দিয়েছে প্রচলিত সামাজিক চুক্তির অন্তঃসারশূণ্যতা' ("VIrus lays bare the frailty of the social contract")।

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন

করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে দেশে দেশে লকডাউন শুরু হওয়ার একেবারে গোড়ার দিকে সুনীল আকাশ, নির্মল প্রকৃতি, প্যারিসের রাজপথে রাজহাঁসের সারি, উটির হাইরোডে বিশ্রামরত হরিণের পাল, ভেনিসের জলে ডলফিনের ডিগবাজি ইত্যাকার ছবি বন্যার স্রোতের মত আমাদের হোয়াটস এ্যাপ, ট্যুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ভরিয়ে তুলেছিল। আর সেইসব ছবি ও ভিডিওগুলোকে, যা কিনা প্রধাণত বিভিন্ন সিনেমার ক্লিপিংস বা অন্য কোনো প্রেক্ষিতে অনেক আগে এবং অন্য কোনো জায়গায তোলা – কোনো রকম বিচার বিশ্লেষণ না ক'রেই আমরাও দিব্যি সত্য ব'লে মেনে নিয়ে পুলকিত হচ্ছিলাম। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে আবিশ্ব লকডাউনের আবহে দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশের অলীক স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আমরা কেউ লক্ষ্যই করি নি যে প্রখ্যাত ন্যাশনাল ওশিয়নিক এ্যান্ড এ্যাটমোস্ফেরিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দেওয়া তথ্য অনুয়ায়ী এই লকডাউনের মধ্যেও গত এপ্রিল, ২০২০ তে বাতাসে কার্বডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব সর্বকালীন রেকর্ড ছাপিয়ে পৌঁছে গেছে ৪১৬.১৭ পার্টস পার মিলিয়নে। সেই সঙ্গে সুচারু কৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল এই বার্তা যে প্রকৃতি বুঝি এই মহামারীর মধ্যে দিয়ে নিজেই নিজের অসুখ সারাতে আদা নুন খেয়ে নেমে পড়েছে। বলা হচ্ছিল প্রকৃতির এহেন কঠিন অসুখের ভাইরাস আসলে আর কেউ নয়; - অগণন, অসংখ্য মানুষ। প্রকৃতির

রোগ সারাতে হ'লে বলি চাই। কোনো বিশেষ জাতিসত্বার বা কোনো বিশেষ বর্ণের কিম্বা কোনো বিশেষ ধর্মের কিছু মানুষের জীবনের বিনিময়েই কেবলমাত্র সেরে উঠতে পারে প্রকৃতি। প্রকৃতির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে এমন দু-এক লাখ কোল্যাটারাল ডামেজ মেনে নেওয়াই বুঝি আমাদের কর্তব্য। আর প্রকৃতি নিজেই নিজের চিকিৎসায় নেমে পড়েছে এমন অদ্ভুতুড়ে তত্ব আমাদের মনোজগতেও অল্প অল্প ক'রে রেখাপাত করতে শুরু করেছিল। সোসাল ডারউইনিজমের নামে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্বের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হাজির করে আমাদের বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা শুরু হয়েছিল প্রকৃতির মারে মরতে হবে তাদেরকেই, যারা অপুষ্টিতে ভুগছে; অপুষ্টির কারনে যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তলানিতে এসে ঠেকেছে। স্বাভাবিক ভাবেই মরতে হবে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত কিছু মানুষকে। আর এই ভাবেই অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে এই পৃথিবীর বুকে কিছু ব্যক্তি মানুষের তথাকথিত টিঁকে থাকার অক্ষমতার ভ্রান্ত ধারনার ওপর সবটুকু দায় চাপিয়ে দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল আসল সত্যটি। আর তা হ'ল প্রাকৃতিক সম্পদের দেদার লুটের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এহেন অতিমারীর মূল কারন। এও একধরনের ফ্যাসিবাদ বই কি! একে আমরা বলতে পারি পরিবেশগত ফ্যাসিবাদ (environmental fascism) বা বাস্তুতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদ (eco-fascism)। ২০১৯ সালে জর্ডন ডাইয়েট ও ক্যাসিডি 'Overpopulation Discourse: Patriarchy, Racism and the Spectre of Ecofascism' নিবন্ধে দেখিয়েছেন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জার্মানিতে কি ভাবে নানা ধরনের পরিবেশগত সমস্যাকে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষের বিরুদ্ধে তীব্র জাতিবিদ্বেষ (xenophobia) তৈরি করার মধ্য দিয়ে আসলে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং শেষপর্যন্ত ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই ট্র্যাডিশনই সমানে চলেছে। এই কোভিড-১৯ অতিমারীর পটভূমিতে অতি সম্প্রতি এই ভারতবর্ষেও আমরা প্রত্যক্ষ করলাম কি ভাবে সংক্রমণের জন্য কেবলমাত্র দিল্লির নিজামুদ্দিনের একটি ধর্মীয় জমায়েতকে দায়ী ক'রে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে টার্গেট করার ঘৃণ্য ও অন্যায় চেষ্টা চালানো হ'ল। এই প্রসঙ্গে জলবায়ু আন্দোলনের নেতা জ্যেমি মার্গোলিয়া সম্প্রতি সঠিক ভাবেই বলেছেন, জলবায়ুর আরোগ্যের জন্য দুর্বল মানুষের মৃত্যু কামনা আর যাই হোক জলবায়ুর প্রতি ন্যায় বিচার হ'তে পারে

না কখনোই ("...the weak will die but it's okay because it helps the climate, is not climate justice.")।

এঙ্গেলস্ সেই কবেই লিখেছিলেন, "আমাদের অবস্থান প্রকৃতির সীমারেখার বাইরে নয়; বরং রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-মেধা-মনন সহ আমরা প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, প্রকৃতির মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব"। মানুষের ইতিহাস ও প্রকৃতির ইতিহাস যে অভিন্ন মার্ক্সও সে কথা বলেছেন বারবার। কিন্তু মুশকিল হ'ল অতিভোগের দর্শন পুঁজিবাদকে এই সরল সত্যটি অস্বীকার করার স্পর্ধা যোগায়। ফলে পুঁজিবাদ প্রকৃতিকে জয় করবার সদম্ভ এক ভ্রান্ত মানসিকতার বশবর্তী হয়ে আরো বেশি মুনাফার লক্ষে প্রাকৃতিক সম্পদের বাধাবন্ধহীণ লুট অব্যাহত রাখে। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চলতে থাকে নির্বিচার অরন্য হত্যা, অপর্যাপ্ত জীবাশ্ম জ্বালাণির দহন অথবা লাগামহীণ দূষণ এবং এসবের হাত ধরে বারবার ফিরে আসে করোনার মত অতিমারী। ফলে পুঁজিবাদ ও পরিবেশের সম্পর্কটা চিরকালই দ্বান্দ্বিক। আর এই দ্বান্দ্বিকতা, সন্দেহ নেই, সব অর্থেই ধ্বংসাত্মক বা ঋণাত্মক দ্বান্দ্বিকতা (negatively dielectic)। প্রখ্যাত পরিবেশ অর্থনীতিবিদ্ ই পি থমসন একেই 'সর্বাগ্রাসী বিধ্বংসিতা' বা 'এক্সটার্মিনিজম (exterminism)' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

মনে রাখা দরকার এই গ্রহের বাস্তুতান্ত্রিক সঙ্কট এবং বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী অর্থনীতির এহেন দ্বিধাগ্রস্ততা ('faltering of the global capitalist economy') – বর্তমান সময়ে পুঁজির গঠনগত সঙ্কটের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক ভাবে পরস্পর যুক্ত দু'টো উপাদান ('dialictically interconnected elements of the structural crisis of capital that defines our age')। মার্কসওতাঃর সময়ের বাস্তবতার নিরীখে এই দ্বন্দ্বের কথা বলে গেছেন, "সভ্যতা ও বিশেষ ক'রে শিল্পের বিকাশ সাধারণ নিয়মেই অরন্য ও প্রকৃতির ধ্বংস সাধনে এতটাই সক্রিয় থেকেছে যে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের যে কোনো উদ্যোগই সেই তুলনায় একেবারেই গুরুত্বহীণ" ("The development of civilization and industry in general has always shown itself so active in destruction of forests that everything that has been done for their conservation and production is completely insignificant in comparison.")।

বিশ্ব বাজারের কানাগলি

প্রাকৃতিক সম্পদ নিঙ্গড়ে মুনাফার পাহাড় গড়তে গিয়ে পুঁজিবাদ যতবার জড়িয়ে পড়েছে এমন গভীর সঙ্কটের আবর্তে, ততবারই সে ওই বাজার নির্ভর অর্থনীতির কানাগলিতেই সঙ্কটমুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে ঘনিয়ে তুলেছে গভীরতর সঙ্কট। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে আমরা তা আরও একবার নতুন ক'রে প্রত্যক্ষ করছি। সঙ্কটাকীর্ণ পুঁজিবাদ যে মুক্ত বাজার অর্থনীতির ভুল পথ ধরেই এগোতে চাইবে, আজ থেকে দেড়'শ বছর আগেই সে কথা মার্কস তাঁর গভীর প্রজ্ঞায় উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের মনে রাখা দরকার মার্কস যে সময় তাঁর দর্শন নির্মান করছেন, সেই সময়কালটা ছিল পুঁজিবাদের উষাকাল। ১৮৩৬ সালে প্রথম ট্রেন চলেছে ইংল্যান্ডের ট্রকটন থেকে ডার্লিংটনের মধ্যে। আর তার মাত্র বারো বছরের মধ্যে মার্ক্স ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইস্তেহার লিখছেন ১৮৪৮ সালে। আজ যে বিশ্বজোড়া লগ্নি পুঁজির দাপট, (যদিও করোনা অতিমারির আঘাতে সেই 'সর্ব রোগহর' লগ্নিপুঁজির বেলুনটি বর্তমানে বেমালুম চুপসে গেছে) সেই ফিনান্স ক্যাপিটাল শব্দবন্ধটি মার্ক্সের পক্ষে সেই সময় দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। তবু লগ্নিপুঁজিই যে পুঁজিবাদের ভবিতব্য, অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতায় সে ইঙ্গিত কিন্তু দিয়ে গেছেন মার্ক্স ও এঙ্গেলস। পুঁজির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস বেছে নিয়েছেন শেক্সপিয়ারের উক্তি, 'money is an eternal prostitute'। 'Freedom of trade' মুক্ত বাণিজ্যের কথাও স্পষ্ট করেই বলে গেছেন তাঁরা, "Under the freedom of trade the whole severity of the laws of political economy will be applied to the working class...by free trade all economical laws, with their most astounding contradictions, will act upon a large scale, upon a greated extent of territory, upon the territory of the whole earth."। করোনা অতিমারির অভিঘাতে অবরুদ্ধ অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে ঠিক সেই কাজটাই তো করতে চাইছে পুঁজিবাদ। পুঁজিকে অবাধ করতে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা তুলে দেওয়ার পক্ষে সব রকম আয়োজন শুরু হয়ে গেছে দেশে দেশে। এই যে করোনার কারনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অর্থ সাহায্য ঘোষণা করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক তার মুখ্য শর্তগুলিই হ'ল – ভর্তুকি তুলে নাও, বাতিল

করো লাইসেন্সিং প্রথা, দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঘটাও কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস। আর ঠিক এই কারনেই লকডাউন তুলে নেওয়ার জন্য ট্রাম্প এতটা মরিয়া অথবা লকডাউনের মধ্যেই আমাদের দেশের যাবতীয় রাষ্ট্রায়ত্ব সম্পদ জলের দরে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে এত ব্যস্ত মোদিজী। নিজেদের সর্বোন্নত দেশ হিসাবে দাবি করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ যখন প্রত্যক্ষ করছে অবিরাম মৃত্য মিছিল তখন সে দেশের ক্ষুব্ধ নাগরিকদের চাপে কার্যত বাধ্য হয়েই করোনা মোকাবিলায় সরকারের পালনীয় কর্তব্য কি হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল নিমরাজি ট্রাম্প প্রশাসনকে। আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ল সেই সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হ'ল উপরাষ্টপতি মাইক পেন্সকে, যিনি কিনা একসময়ে সিগারেট উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলির স্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ হ'য়ে নিদান দিয়েছিলেন, "গণমাধ্যম ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে যতই গণ উন্মাদনা সৃষ্টি করার চেষ্টা হোক না কেন, ধূমপান কখনোই মৃত্যুর কারন নয়" ("despite the hysteria from the political classes and media, smoking does not kill."); অথবা কর্পোরেট তেল কোম্পানিগুলির পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন, "বিশ্ব-উষ্ণায়ণ একটি ভ্রান্ত ধারনা ছাড়া কিছুই নয়" ("Global warming is nothing but a myth")। এইভাবে পুঁজির অবাধ চলাচলের পথ সুগম করতে গিয়েই ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠতে থাকে পুঁজিবাদ বনাম শ্রমিকের দ্বন্দ্ব।

মার্কস তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে পুঁজিবাদের গতিধারাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কি ভাবে শ্রমিকের শ্রম চুরি করেই তৈরি হয় উদ্বৃত্তমূল্য যা থেকে আসে পুঁজিমালিকের বিপুল মুনাফা। ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত 'Wages and Labour'-এ তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীকে ঠিক কোন দৃষ্টিভংগীতে দেখা হয়ে থাকে, "it regards the proletarians...like a horse, he must receive enough to enable him to work."। কিন্তু যখন তার আর কিছু দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না তখন পুঁজিবাদী তার দিকে ফিরেও তাকায় না। আমাদের দেশে অপরিকল্পিত লকডাউনের কারনে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের দুঃসহ যন্ত্রণা আর মৃত্যু মিছিল আমরা ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। এমনকি কর্পোরেট স্বার্থবাহী সরকার কি ভাবে

সংসদকে এড়িয়ে শ্রমিকের মজুরি হ্রাস, আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন ক'রে অন্যায় ভাবে কাজের সময় বৃদ্ধি এবং এমন কি ঘুরপথে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাইকে বৈধতা দিল তাও আমরা দেখেছি। এই করোনা অতিমারীর প্রেক্ষিতে আমারা শুনেছি আমেরিকার টেক্সাসের লেফটেন্যান্ট জেনারেল ড্যান প্যাট্রিক ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাতকারে কেমন অম্লান বদনে বলে দিলেন, কোভিড-১৯ এর ধাক্কায় মার্কিন অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তুলনায় বরং বয়স্কদের মৃত্যুই অধিকতর কাম্য ("Older people would rather die than let CoViD-19 harm US economy.")। মনে রাখা ভালো, আমেরিকায় করোনার মারে এত মানুষের মৃত্যুর পিছনে লুকিয়ে আছে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্পোরেট স্বাস্থ্য বিমা শিল্পের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতা। আমাদের দেশকেও সেই পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ক্রমশ।

যারা এতদিন ভ্রু কুঁচকে সোচ্চারে বলে গেছেন বিশ্বায়িত অর্থনীতির যুগের আধুনিক শ্রমিক আর মার্ক্সের সময়ের শ্রমিক কখনোই এক হ'তে পারে না অথবা যারা ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন মাসে কয়েক লক্ষ টাকা মাইনে পাওয়া, কোম্পানি ডিরেক্টর বা খোদ মালিকের সঙ্গে পাঁচতারা হোটেলের ডিনার পার্টি কিম্বা নাইট ক্লাবে যাওয়া তথাকথিত সাদা কলারওয়ালা চাকুরেদের কি প্রোলেটারিয়েট বলা যায় আদৌ; সেই অতি বোদ্ধারাই, আজ যখন অতিমারির দোহাই দিয়ে এক ধাক্কায় কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর কর্মচারীদের মাইনে, অথবা এমনকি দলে দলে ছাঁটাই ক'রে দেওয়া হচ্ছে তাদের, তখন বড় আতান্তরে পড়ছেন সন্দেহ কি! ক্যাপিটালের প্রথম অধ্যায়েই মার্ক্স কিন্তু ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন শ্রমিক মানেই কেবল হাতুড়ি পেটানো নয়, ব্যাক্তি মালিকানাধীন কোনো বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আর সসেজ কারখানার একজন মজুরের মধ্যে আসলে মূলগত কোনো ফারাক নেই, "A school master is a productive labourer when in addition to belabouring the heads of the scholar, he works like a horse to enrich the shool proprietor. That the later has laid our his capital in a teaching factory instead of a sausage factory, does not alter the relation."। আজ অবশ্য এই কথা অনেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করছে।

মার্কসের দেখানো পথেই মুক্তির ঠিকানা

১৯৬১ সালে বের্টোল্ট ব্রেশট্ তাঁর 'Tales from the Calender'-এ লিখেছিলেন বাড়িতে আগুন লাগলে সে বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসাটাই কাজের কথা। এক সময় যারা সদম্ভে বলতেন পুঁজিবাদের শেষ হওয়া মানে পৃথিবীর অস্তিত্বেরও ইতি ('End of Capitalism means end of the world'); করোনা অতিমারির অভিঘাতে ত্রাহি রবে পুঁজিবাদের জতুগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ইতিমধ্যেই ইতালির মত দেশ মর্টগেজে ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করতে কার্যত বাধ্য হয়েছে, ফ্রান্সের সরকার নানা ধরনের বিল ও কর প্রদান আপাতত স্থগিত ঘোষণা করেছে, স্পেন ব্যক্তি মালিকানাধীণ কর্পোরেট হাসপাতালগুলোকে রীতিমতো ডিক্রি জারি ক'রে রাষ্ট্রীকরণ করেছে, এমন কি আমেরিকাও জনগনের চাপে প্রয়োজনের তুলনায় কম হ'লেও সে দেশের কাজ হারানো মানুষের হাতে টাকা তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের দেশেও আওয়াজ উঠেছে আয়করের আওতায় পড়ে না এমন প্রতিটি কাজ হারানো অসংগঠিত শ্রমিকের হাতে আগামি অন্তত ছ'মাসের জন্য প্রতি মাসে তুলে দিতে হবে কম ক'রে সাড়ে সাত হাজার টাকা।

ইয়েল স্কুল অব পাবলিক হেল্থ-এর অধ্যাপক জাসো শোয়ার্টজ্ সঠিক ভাবেই বলেছেন এই শতাব্দীর গোড়ায় যখন বিশ্বে প্রথমবারের জন্য করোনা ভাইরাস-১(CoV-1)-এর সংক্রমণ ঘটেছিল (যে ভাইরাস আজকের নোবেল করোনা ভাইরাস বা CoV-1 এর পূর্বসূরী), সেই সময় থেকেই যদি টিকা তৈরির প্রয়াস জারি রাখা যেত তাহ'লে আজকের নোবেল করোনা (CoV-2) প্রতিরোধী টিকা তৈরি করার কাজটা, সন্দেহ নেই, অনেক সহজ হ'তে পারতো। কিন্তু বাজার নির্ভর অর্থনীতি আপাত চাহিদাহীণ পন্য তৈরি করার ক্ষেত্রে কখনোই বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখায় না। অধ্যাপক শোয়ার্টজের কথায়, "Low term government investments matter, because creating vaccines, antiviral medicines and other vital tools required decades of serious investments even when demand is low. Market based economy often struggle to develop a product for which there is no immediate demand."। এই মহামারী আসলে আজকের বাজার সর্বস্ব পুঁজিবাদের ঝকমকে রঙদার নির্মোক খসিয়ে ভেতরের অস্থিসার কদর্য্য চেহারাটা উলঙ্গ করে দিয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতা

থেকেই মানুষ আজ বুঝতে পারছে কেএফসির চিকেনের ঠ্যাং অথবা ডোমিনোজের পিজা না চিবিয়েও দিব্যি বেঁচে থাকা যায়। সে বুঝতে পারছে আলো ধলমল ঝাঁ চকচকে শপিং মলের বৈভব নয়, এই সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের রক্ষা করতে পারে কেবল পাড়ার মুদি দোকানের পরিচিত দোকানি অথবা শহরতলি থেকে ভ্যান রিক্সায় সবজি বা মাছ বয়ে আনা গ্রাম্য লোকটাই।

স্লোভানিয়ার মার্ক্সীয় তত্ববিদ স্লাভোই জিজেক গত এপ্রিল মাসে 'Pandemic – CoViD-19, Shakes the World' শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ বই লিখেছেন। কোভিডের মারে ভোগবাদ সম্পর্কে মোহভঙ্গের পর লকডাউন পরবর্তী দুনিয়াটা কেমন হ'তে চলেছে সে সম্পর্কে জিজেক লিখছেন, "…the abandoned streets in a megalopolis – the usually bustling urban centres looking like ghost town; stores with open doors and no customers, just a lone walker or a car here and there provide a glimpse of what a non-consumerist world look like." জিজেকের ভাষায়, 'আজ যে সব পদক্ষেপ আমাদের সামনে কমিউনিস্ট সুলভ ব'লে মনে হচ্ছে তাকে সমগ্র বিশ্বজুড়েই প্রয়োগ করার কথা ভাবতে হবে' ("Measures that appear to most of us today as communist will have to be considered on a global level")। তাঁর মতে, 'আগামি দিনে আমাদের মুক্তির দিশা খুজতে হবে 'বাজারের বোঝাপড়ার নিয়ামকগুলির বাইরে বিশ্বজুড়ে গড়ে তোলা উৎপাদন ও বন্টনের এক সুষম সমন্বয়ের মধ্যেই' ("Co-ordination of production and distribution will have to take place outside the co-ordinates of the market.")। সন্দেহ নেই করোনা অতিমারি প্রতি মুহূর্তে চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমান করে দিয়ে যাচ্ছে বাজার নির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির অসারত্ব। করোনা প্রমান করেছে এই পচাগলা নড়বড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসপ্রাপ্তি মানেই সমস্ত দুনিয়াদারির সমাপ্তি নয়। এই ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থার কঙ্কালের ওপরেই নির্মিত হবে এক নতুন ব্যবস্থা। বাজার অর্থনীতি আর বিলগ্নিকরণের বিপ্রতীপে কায়েম হবে রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। আমাদের বেছে নিতে হবে ধ্বংস অথবা সমাজতন্ত্র। জারি রাখতে হবে সেই লক্ষ অর্জনের লড়াই। আর সে জন্য যা দরকার তা হ'ল সামির আমিন তাঁর 'The Implosion of Contemporary Capitalism'-এ যেমনটা বলেছেন, "…audacity, more audacity, always audacity"। চাই স্পর্ধা, আরও স্পর্ধা, প্রতি মুহূর্তের স্পর্ধা।

প্রবন্ধ

গুজবের গেরোয় করোনা অতিমারি

সৌম্যকান্তি জানা

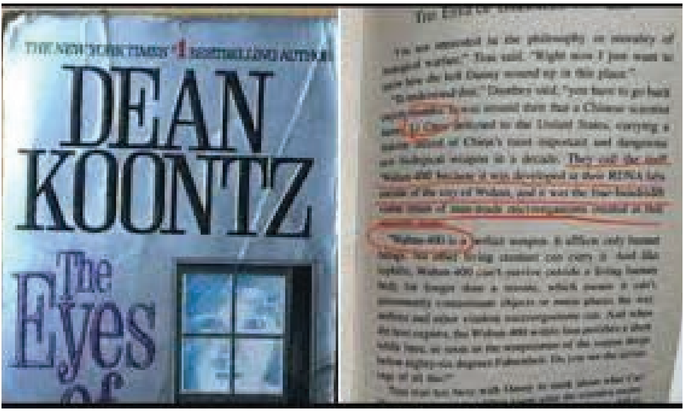

ইতিহাসে 'ব্ল্যাক ডেথ'-এর কথা অনেকেই জানেন। ১৩৪৭ থেকে ১৩৫১ পাঁচ বছর ভয়ানক বিউবোনিক প্লেগ রোগের সংক্রমণে ইউরোপের প্রায় অর্ধেক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এই প্লেগ রোগের কারণ আমরা এখন জানি। ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস নামে ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের প্লেগ রোগ সৃষ্টি করে। আর ইঁদুরের গায়ে থাকা একপ্রকার মাছি এই ব্যাকটেরিয়াকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত করে। কিন্তু এই বিজ্ঞান চতুর্দশ শতকে ছিল অজ্ঞাত। লোকে ভাবল, কুয়োর জলে বিষ মেশানো হয়েছে, আর সেই জল পান করেই মানুষ মারা যাচ্ছে। গুজব রটল, খ্রিস্টানদের মেরে ফেলার জন্য ইহুদিরা লুকিয়ে কুয়োতে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। ঝড়ের গতিতে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল পুরো ইউরোপে। খ্রিস্টানদের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ল সংখ্যালঘু ইহুদিদের উপর। নানা জায়গায় অসংখ্য ইহুদিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। যারা বেঁচে রইল হয় তাদের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে

বাধ্য করা হল কিংবা তাদের সমস্ত অর্থ, জমিজমা কেড়ে নেওয়া হল। ব্ল্যাক ডেথের সাথে ইহুদি গণহত্যার নির্মমতার সাক্ষী রয়েছে ইতিহাস।

মহামারি বা অতিমারি মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন কোনও ঘটনা নয়। কখনও ব্যাকটেরিয়া, কখনও ভাইরাস চরম আঘাত হেনেছে মানব সভ্যতার অহঙ্কারে। জীবানুদের সাথে নিয়েই আমাদের বসবাস। তাই তাদের সাথে কখনও বন্ধুত্ব, কখনও সহযোগিতা, আবার কখনও বৈরিতা অবশ্যম্ভাবী। এ সবই স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা। কিন্তু ইতিহাস বলে, প্রত্যেকবারই অতিমারি বা মহামারির মতো জৈবিক ইস্যুকে গুজবের মোড়ক দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এর পেছনে চিরকালই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির মতলবে কাজ করেছে ধুরন্ধর কিছু মস্তিষ্ক – সে চোদ্দ শতকের বিউবোনিক প্লেগ হোক আর বর্তমানের করোনা অতিমারি হোক।

কথায় বলে, হাওয়ার চেয়েও দ্রুত ছড়ায় গুজব। কিন্তু প্রযুক্তির কল্যাণে এখন কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া কিংবা মস্কো থেকে মেলবোর্ন গুজব ছড়ায় মুহূর্তে। গুজব ছড়ানোর সেরা মাধ্যম এখন সোশ্যাল মিডিয়া। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে গুজব তৈরি করা হয় তাতে সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ আবেগপ্রবণ এবং কোনও কিছু খুঁটিয়ে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে না তাই তাদেরকেই গুজব ছড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। ভারত-চিন সীমান্ত সমস্যা ও পাকিস্তান-চিন সখ্যতা যেমন অধিকাংশ ভারতীয়দের মনে চিন সম্বন্ধে বিরূপ মানসিকতা তৈরি করেছে তেমনই বিশ্ব অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রক হিসেবে চিনের উত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী দেশগুলোর কাছে চিন সম্পর্কে বৈরি মনোভাব তৈরি করেছে। আর যেহেতু করোনা অতিমারির উৎস চিন তাই ওই সব দেশের ‘পাকা মাথারা’ চিন সম্পর্কে গুজব তৈরি করতে সময় নষ্ট করেনি। সুকৌশলে গুজবগুলি ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন মোড়কে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

যেমন প্রথমেই ধরা যাক, ডিন কুঁজের (Dean Koontz)-এর ভবিষ্যৎবাণীর কথা। টুইটার, ফেসবুক ও হোয়াটস অ্যাপে বইয়ের একটা পৃষ্ঠার ও ওই বইয়ের মলাটের ছবি দিয়ে দুনিয়া জুড়ে প্রচার হল, ডিন কুঁজ নামে এক “বিজ্ঞানী” ১৯৮১ সালে “The Eyes

of Darkness” শিরোনামে একটা বই লিখেছিলেন যেখানে নাকি তিনি লিখেছিলেন চিনের উহানে ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে মারণ ভাইরাস তৈরি করা হচ্ছে। এই পোস্টটি মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় বিশ্বজুড়ে।

কিন্তু বিষয়টা কি সত্যি? না, এ হল সামান্য সত্যির মোড়কে অসামান্য এক গুজব। বইটি আসলে কোনও বিজ্ঞান বিষয়ক বই-ই নয়, একটি থ্রিলার উপন্যাস। আর এর স্রষ্টা ডিন কুঁজ বিজ্ঞানী নন, একজন মার্কিন ঔপন্যাসিক। এই উপন্যাসের এক চরিত্র ডোম্বে (Dombey) এক জায়গায় বলছে, “সেই সময় (প্রায় কুড়ি মাস আগে) লি চেন নামে এক চিনা বিজ্ঞানী দেশত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন যিনি আসার সময় চিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক ও নতুন জৈব অস্ত্রের তথ্য সংবলিত একটা ফ্লপি ডিস্ক সাথে নিয়ে আসেন। তাঁরা ওই জিনিসটার নাম দিয়েছেন ‘উহান-৪০০’ কারণ এটা উহান শহরের বাইরে RDNA গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে এবং এটা হল ওই গবেষণাগারে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ৪০০ গুণ বেশি সংক্রামক জীবানু।” এবার আসল মিথ্যাচারের ব্যাপারটি বলি। কুঁজ ১৯৮১ সালে এই উপন্যাসটি যখন লেখেন তখন তিনি ওই জৈব অস্ত্রের নাম দিয়েছিলেন “গোর্কি-৪০০”, কারণ তাঁর উপন্যাসের ঘটনাস্থল ছিল রাশিয়ার গোর্কি শহর আর পালিয়ে আসা বিজ্ঞানী ছিলেন রাশিয়ার। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া) তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষ। স্বভাবতই কুঁজের উপন্যাসে তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী ভাবনার অস্তিত্ব ছিল। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রতিপক্ষ হিসেবে উঠে আসছিল চিন। তাই কুঁজ ওই একই উপন্যাসের ১৯৮৯ সালের সংস্করণে ঘটনাস্থল পাল্টে করে দেন চিন, আর বিজ্ঞানীটিকে চিনা দেখিয়ে জৈব অস্ত্রের নাম পাল্টে করেন “উহান-৪০০”। আবার ওই ডোম্বে নামের চরিত্রটির মুখ দিয়ে কুঁজ বলিয়েছেন যে উহান-৪০০ (বা গোর্কি-৪০০) হল এমনই এক ভয়ঙ্কর ভাইরাস যার সংস্পর্শে আসার ২৪ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়, আর এর মারণ ক্ষমতা ১০০ শতাংশ।

কিন্তু করোনা অতিমারি সৃষ্টিকারী SARS CoV-2 ভাইরাস কি সত্যিই তাই? এই ভাইরাস মানুষের মধ্যে প্রবেশ করলে যে সবার

মধ্যেই রোগলক্ষণ দেখা দেবে তার নিশ্চয়তা নেই। আক্রান্তদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও অসুস্থ তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনাবেশি। বর্তমানে এই ভাইরাস সংক্রমণে বিশ্বে গড় মৃত্যুহার ৪ শতাংশের কম। সুতরাং কুঁজের উপন্যাসের মধ্যে ভাইরাসটি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সাথে বিন্দুমাত্র মিল নেই SARS CoV-2 ভাইরাসের। আর যদি সামান্য মিলও থাকত তা হত নেহাতই কাকতালীয়। যাঁরা গুজবটির স্রষ্টা, তাঁরা কি এগুলো জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে সাধারণ মানুষ ওই উপন্যাসের বিন্দুবিসর্গ জানে না। আর তাই তাঁরা ঘৃণ্য এই গুজবের আশ্রয় নিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সামাজিক মাধ্যম তোলপাড় হয়ে উঠল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যে যে এই ভাইরাস হল চিনের ল্যাবে তৈরি জিন-প্রযুক্তিতে তৈরি ভাইরাস (Bio-engineered virus)। এই ভাইরাসটি নাকি হয় উহানের ল্যাব থেকে অসাবধানতাবশতঃ 'লিক' করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে নয়তো চিন ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। ট্রাম্প মহাশয় এ-ও জানালেন যে তাঁর কাছে নাকি চিনের 'ষড়যন্ত্রের' সব প্রমাণ আছে। ঠিক এই সময়ে মঞ্চে আবির্ভূত হলেন ফ্রান্সিস বয়েল। কে তিনি? তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ের প্রফেসর। তিনি মার্কিন দেশে জৈব অস্ত্র সন্ত্রাসবাদবিরোধী আইন-১৯৮৯ (Biological Weapons Anti-Terrorism Act – 1989)-এর খসড়া তৈরি করেছিলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বললেন যে তাঁর 'ধারণা' নভেল করোনা ভাইরাস উহানের বায়োসেফটি ল্যাবে তৈরি একটি জৈব অস্ত্র এবং তা লিক করে বেরিয়ে এসেছে। ব্যস! গুজবকারীদের হাতে চলে এল 'প্রমাণ'! তাঁরা আইনজ্ঞ প্রফেসর বয়েলকে বানিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী বয়েল। কয়েকটি বাংলা নিউজ চ্যানেলও 'বিজ্ঞানী বয়েল' বলে সংবাদ পরিবেশন করল। আর এভাবেই গুজবকারীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে গেঁথে দিল আরও এক ভ্রান্ত ধারণা।

এবার দেখে নিই, সত্যিটা কী। আমেরিকার স্ক্রিপস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ইমিউনোলজি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসন, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভোলিউশনারি বায়োলজির বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু র্যারমবট ও আমেরিকার টুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মেডিসিনের বিজ্ঞানী রবার্ট গ্যারির

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী তাসুকু হানজো

গবেষণাপত্র যা বিশ্বখ্যাত নেচার মেডিসিন পত্রিকায় ১৭ মার্চ, ২০২০ প্রকাশিত। তাঁরা বলেছেন, SARS CoV-2 এর আনবিক গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তা চেনা ছ'টি মানব করোনা ভাইরাসের থেকে ভিন্ন এবং বাদুড় ও প্যাঙ্গোলিনের করোনা ভাইরাসের সাথে বেশি সাদৃশ্যযুক্ত। তাঁরা আরও বলেছেন যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই ভাইরাসটির স্পাইকের 'হুক' অংশ মানব কোশের পর্দাস্থিত গ্রাহক প্রোটিন ACE-2 -এর সাথে অত্যন্ত নিপুনভাবে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাছাড়া নভেল করোনা ভাইরাসের জিনের সজ্জাক্রম বিশ্লেষণ করে যা যা তথ্য পাওয়া গেছে তার সাথে বিজ্ঞানীরা মানুষের বাকি ছ'টি করোনা ভাইরাসের জিনের সজ্জাক্রম তুলনা করে তেমন উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পাননি। আর তাই তাঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন – "Our analyses clearly show that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct or a purposefully manipulated virus." তাঁরা নিশ্চিত হয়ে বলছেন, "We can firmly determine that SARS CoV-2 originated through natural process"।

মার্চ মাসে বিখ্যাত লাইভ সায়েন্স পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা

হয়েছে, বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে মারণক্ষমতাসম্পন্ন নভেল করোনা ভাইরাস তৈরি করতে গেলে তা বাদুড় বা প্যাঙ্গোলিনের করোনা ভাইরাসের কাঠামোর উপরেই তৈরি করতে হত। কিন্তু বাদুড় বা প্যাঙ্গোলিনের করোনা ভাইরাস নিয়ে চর্চা হয়েছে খুব কম এবং কখনও মানুষের ক্ষতি করেছে বলে জানা যায়নি। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ছাড়া ACE-2 গ্রাহক প্রোটিনের সাথে সংযুক্তির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী স্পাইক-প্রোটিন উদ্ভব সম্ভব নয়। মেডিক্যাল নিউজ টুডে পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে ড. অ্যান্ডারসন বলেছেন, "These two features of the virus – the mutation in the RBD (Receptor Binding Domain) portion of the spike protein and its distinct backbone rule out laboratory manipulation as a potential origin for SARS CoV-2"।

লাইভ সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশ, বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার মডেলের মাধ্যমে মিউটেশন দ্বারা SARS CoV-2 ভাইরাসের উৎপত্তি সম্ভব কিনা তা বিশ্লেষণ করে এই ভাইরাসের যেসব মডেল খাড়া করেছেন তার সাথে আসল SARS CoV-2-এর অনেক পার্থক্য পাওয়া গেছে। আর মডেলের ভাইরাসের আসল ভাইরাসের মতো এত তীব্র সংক্রমণ ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয় বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। অর্থাৎ সুপার কম্পিউটারের অতি বুদ্ধিমান 'মস্তিষ্ক' SARS CoV-2 কে যতটা বিপজ্জনক করতে সক্ষম তার চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক প্রকৃত SARS CoV-2। বিজ্ঞানীরা যদি ল্যাবে এই ভাইরাস তৈরি করতেন তবে সুপার কম্পিউটারের বুদ্ধির বাইরে গিয়ে তো আর কিছু ভাবা সম্ভব হত না। আর তাই তাঁদের সিদ্ধান্ত হল, যে মিউটেশনের মাধ্যমে SARS CoV-2 -এর উৎপত্তি তা বিজ্ঞানীদের (সুপার কম্পিউটারের) কল্পনার অতীত। ল্যাবে বিজ্ঞানী বা কম্পিউটারের বুদ্ধি দিয়ে এ জিনিস বানানো সম্ভব নয়। আর তাই আবারও এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে "Nature is smarter than Scientists"।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা দ্য ল্যানসেট (The Lancet)-এর নাম সুবিদিত। চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত সেরা গবেষণাপত্রগুলো এখানেই প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বিশ্বের প্রথম সারির একদল বিজ্ঞানীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ওই বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, "The

rapid, open and transparent sharing of data on this outbreak is now being threatened by rumours and misinformation around this origins. We stand together to strongly condemn conspiracy theories suggesting that COVID-19 does not have a natural origin. Scientists from multiple countries have published and analysed genomes of the causative agent, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and they overwhelmingly conclude that this coronavirus originated in wildlife. as have so many other emerging pathogens.”

বন্যপ্রাণীই যে SARS CoV-2-এর উৎস তা নিশ্চিত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) – “The analyses of the published genetic sequences further suggest that the spillover from an animal source to humans happened during the last quarter of 2019”। ‘গবেষণাগারে তৈরি ভাইরাস’- এই গুজবের বিপক্ষে WHO-এর মুখপাত্র ফাডেলা চাইব ২১ এপ্রিল সংবাদমাধ্যমে বলেন, “All available evidence suggests the virus has a animal origin and in not manipulated or constructed in a lab or somewhere else.”

তবে চিনের লোকেরাও কিন্তু আবার এই “Bio-engineered Virus” তত্ত্বকে বিশ্বাস করে বিপরীত দৃষ্টিকোনে। তাঁদের ভ্রান্তবিশ্বাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ভাইরাস তৈরি করে তাদের দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার ইরান ও আরবে গুজব ছড়িয়েছে, ইসলাম বিরোধীরা এই ভাইরাস ল্যাবে তৈরি করে তাদের দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সন্দেহের তীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের দিকে। গুজব রটেছে ভাইরাস চুরিরও। কানাডার এক গবেষণাকেন্দ্রে নাকি এই ভাইরাস তৈরি করা হয়েছিল, আর সেখানে কর্মরত কয়েকজন চিনা বিজ্ঞানী ওই ভাইরাস চুরি করে চিনে নিয়ে গেছে! অবশ্য Health Canada এবং Public Health Agency of Canada এই গুজবের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে “No factual basis”।

কিছুদিন আগে গুজব ছড়াল, মোবাইলের ৫জি নেটওয়ার্ক থেকে এই SARS CoV-2 ভাইরাসের সৃষ্টি। এই কু-তত্ত্বের স্রষ্টা বেলজিয়ামের এক ডাক্তার। মূলতঃ নানা দেশের সেলিব্রিটিরাই

এই গুজব ছড়িয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ চিনে গত নভেম্বর মাসে ৫জি নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে। এই গুজবে বিশ্বাস করে ইউরোপের নানা দেশে ৫জি টাওয়ার পুড়িয়ে বা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদের চূড়ান্ত হেনস্তা করা হয়েছে। অথচ WHO ফেব্রুয়ারি মাসেই বিবৃতি দিয়েছে – "to date, and after much research preformed, no adverse health effect has been causally linked with exposure to wireless technologies." WHO আরও বলেছে, "Viruses can not travel on radio waves/ mobile networks. COVID-19 is spreading many countries that do not have 5G mobile networks." UNICEF, UNESCO এবং ITU (International Telecommunications Union) থেকেও অনুরূপ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। দেশবিদেশের বিজ্ঞানীরাও এই গুজব না ছড়ানোর জন্য মানুষকে সচেতন করেছেন।

মিথ্যাচার করা হয়েছে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীকে নিয়েও। ২০১৮ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেলজয়ী কিয়েটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাপক প্রফেসর তাসুকু হঞ্জোর নামে ফেক টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে তাঁর মুখে মিথ্যে কথা বসিয়ে দেওয়া হয় - করোনা মহামারি সৃষ্টিকারী ভাইরাস প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নয়, চিনের তৈরি। গত ২৮ এপ্রিল প্রফেসর হঞ্জো এ নিয়ে সরকারিভাবে বিবৃতি দেন। দেখে নিই তিনি কী বলেছেন - "In the wake of the pain, economic loss and unprecedented global suffering caused by COVID-19 pandemic, I am greatly saddened that my name and that of Kyoto University have been used to spread false accusations and misinformation." একে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কী বলা যায়!

আর এক গুজব রটল, নভেল করোনা ভাইরাস উহান ল্যাবরেটরি থেকে অসাবধানতাবশতঃ লিক করেছে। গুজবটি প্রথম ছড়ান সম্ভবতঃ স্টিভেন মোশার নামে এক সমাজবজ্ঞানী ও ভার্জিনিয়ার পপুলেশন রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সভাপতি। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে তাঁর এই 'Lab escape' তত্ত্ব নিউইয়র্ক পোস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তারপর এই তত্ত্ব সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এই বক্তব্য আরও জোরালো হয় মার্কিন সেনেটর টম

কটনের সমর্থনে। ডোনাল্ড ট্রাম্পও একাধিকবার ভাইরাস লিকের কথা বলেছেন।

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া নিয়ে যে সব ল্যাবে গবেষণা করা হয় সেখানে BSL (Bio Safety Level) স্ট্যান্ডার্ড অণুসরণ করা হয়। কী কী ধরণের জীবানু নিয়ে গবেষণা হচ্ছে এবং কী কী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন তার ভিত্তিতে চার প্রকার BSL রয়েছে। BSL-4 হল সর্বোচ্চ নিরাপত্তা। এই ধরণের ল্যাবে সেইসব বিপজ্জনক জীবানু নিয়ে গবেষণা করা হয় যার ভ্যাকসিন অনাবিষ্কৃত বা চিকিৎসার সুযোগ খুব কম। যেমন ইবোলা ভাইরাস, মারবার্গ ভাইরাস ইত্যাদি। বিশ্বে যে প্রায় ৫০টি BSL-4 ল্যাব রয়েছে Wuhan Institute of Virology (WIV) হল সেগুলোর একটি। যে কোনও BSL-4 ল্যাবে কঠোর নিরাপত্তা বলবৎ থাকে। তুলনায় BSL-1, 2 বা 3 ল্যাবে নিরাপত্তা কম। এইসব ল্যাবে তাই কখনও কখনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু BSL-4 ল্যাব থেকে এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিডেমিওলজির প্রফেসর তথা Monitoring Emerging Virus Project (PREDICT)-এর ডিরেক্টর ড. জোনা মাজেট জানিয়েছেন – WIV এর সমস্ত কর্মী মার্কিন ল্যাবে প্রশিক্ষিত এবং ওই ল্যাব অতি উচ্চ নিরাপত্তার মান বজায় রাখে, তাই এই ভাইরাসের ল্যাব থেকে বাইরে আসার তত্ত্ব ঠিক হতে পারে না।

ইকো হেলথ অ্যালায়েন্স ও ডিজিজ ইকোলজিস্ট-এর সভাপতি ড. পিটার দাসজাক WIV-তে ১৫ বছর সংক্রামক রোগের জীবানু নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর কথায়, তিনি নিশ্চিত যে এই ভাইরাস বাদুড় থেকেই এসেছে, কোনওভাবেই ল্যাব থেকে লিক করে আসেনি। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ প্রফেসর অ্যাঞ্জেলা রাসমুসেনেরও একই বক্তব্য – ল্যাব থেকে লিক তত্ত্ব অসম্ভব।

হ্যাঁ এটা ঠিক যে ২০০৪ সালে চিনে সার্স মহামারির পর উহানের ল্যাবে বন্যপ্রাণীর করোনা ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ওখানে যে সব করোনা ভাইরাসের নমুনা নিয়ে গবেষণা চলছে তার সাথে SARS CoV-2 ভাইরাসের বিস্তর ফারাক রয়েছে। সবচেয়ে কাছের যে ভাইরাসের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া

গিয়েছে সেটি হল ইউনান প্রদেশ থেকে সংগৃহীত বাদুড়ের করোনা ভাইরাস যা RaTG13 নামে চিহ্নিত। এই নমুনার সাথে SARS CoV-2 এর পার্থক্য রয়েছে ৪ শতাংশ। এটা জেনে যদি কেউ সেই ‘চিনা ষড়যন্ত্র’ বলে ভেবে বসেন তবে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের SARS CoV-2 গবেষক এডওয়ার্ড হোমসের মন্তব্যটা মাথায় পুরে নিন – এই ৪ শতাংশ পার্থক্য গড়ে ৫০ বছরের (কমপক্ষে ২০ বছরের) বিবর্তনগত পরিবর্তনের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ ভাইরাসটির নিদেনপক্ষে ২০ বছর লাগবে বাদুড় থেকে মানুষে সংক্রমণযোগ্য হয়ে উঠতে। সুতরাং যে ভাইরাস নিয়ে এই সেদিন গবেষণা শুরু হল তার পক্ষে ল্যাব থেকে লিক করে বেরিয়ে মানুষে সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হওয়া অসম্ভব। WHO এই ল্যাব থেকে লিক তত্ত্বকে বলেছে – অনুমানসাপেক্ষ (Speculative)। প্রকৃতপক্ষে, এই ল্যাব লিক তত্ত্বের সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। আর যার প্রমাণ নেই তাকে বিশ্বাস করব কোন যুক্তিতে? তাই WHO-এর ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রোস আধানোম ঘেব্রেয়েসাস যথার্থই বলেছেন – “We’re not fighting an epidemic, we’re fighting an infodemic.” ।

সম্প্রতি “Sinophobia” নামে একটি পরিভাষা বেশ শোনা যাচ্ছে যার অর্থ হল Antichinese sentiment। যেহেতু ভারতবর্ষসহ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের মানুষের কাছে চিন হল অপছন্দের দেশ তাই ওই দেশ সম্পর্কিত যে কোনও নেতিবাচক বার্তা খুব দ্রুত মানুষ গ্রহণ করে এবং তা আরও দ্রুত প্রচারের ব্যবস্থা করে। কথায় বলে ‘চোরা না শুনে ধর্মের কথা’। করোনা অতিমারির ক্ষেত্রেও একটু পাল্টে নিয়ে বলা যায় – Sinophobic-রা না শুনে বিজ্ঞানীদের কথা! আর তাই আজও সোশাল মিডিয়ায়, এমনকি কিছু সংবাদমাধ্যমেও নভেল করোনা ভাইরাস ‘জৈব অস্ত্র’, ‘প্রযুক্তিগতভাবে নির্মিত’ কিংবা ‘ল্যাব থেকে লিক’ - এই গুজবের গেরোতে আটকে আছে!

প্রবন্ধ

মারী ও মড়ক কলকাতার মহামারীর ইতিকথা

সপ্তর্ষি চৌধুরী

১৮৯৪ সালে কলকাতায় কলেরা মোকাবিলায় চিকিৎসা শিবির

বহু বছর আগে সুকান্ত ভট্টাচার্য তার 'বোধন'কবিতায় লিখেছিলেন,

"মারী ও মড়ক মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার/ আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন/ ভাঙা নৌকার পাল/ এখানে দারুণ দুঃখে কেটেছে সর্বনাশের কাল"।

এখন সারাবিশ্ব মারণ ভাইরাসের কবলে। আমাদের শহর কলকাতাও তা থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু প্রথমবারের মতো মহামারী কলকাতাকে গ্রাস করেছে বিষয়টা ঠিক সেরকম নয়। এর

আগেও বহুবার মহামারীর সাক্ষী থেকেছে কল্লোলিনী। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষ শাসন করছে তখন একাধিকবার মৃত্যু মিছিল দেখেছিল এই শহর।

১৬৯০ সাল নাগাদ জোব চার্নক মহাশয় কাশিমবাজার কুঠি থেকে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, ইচ্ছা ছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবেন। এর আগে অবশ্য দক্ষিণবঙ্গের হিজলি নামক স্থানে জাহাজের নোঙর ফেলেছিলেন। হিজলি অঞ্চলটি ছিল সমুদ্র তীরবর্তী এবং সেখানে মুঘলদের হানা দেওয়ার সম্ভবনা কম ছিল কিন্তু বাধ সাজল সেখানকার আবহাওয়া। তার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল পানীয় জলের সমস্যা। কেননা কথায় আছে, 'একবার খেলে হিজলি পানি/যমে মানুষে টানাটানি'। আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে নাকি হিজলির জল স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক ছিল। জল একবার পেটে গেলে আর রক্ষা ছিল না। তাই সাহেব ঠিক করলেন এখানে থাকা আর ঠিক হবে না। নিজের দলবল নিয়ে মাদ্রাজে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেবের স্নেহধন্য ইব্রাহিম খাঁ বাংলার মসনদে বসলেন। মুঘলদের সম্মতি পাওয়ার পর চার্নক ফিরে এলেন কলকাতায়। তখনো পর্যন্ত কলকাতা গড়ে ওঠেনি। জাহাজের নোঙর ফেললেন গঙ্গার পাড়ে সুতানুটিতে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া সাহেবদের মানিয়ে নিতে অসুবিধা হল। মৃত্যু হল অনেকের।

ইতিমধ্যে কেটে গেছে বেশ কয়েকবছর। জোব চার্নকেরও মৃত্যু হয়েছে। ১৭০০ সালে হ্যামিল্টন সাহেবের তথ্য অনুযায়ি, সেই সময় কলকাতায় বসবাস করছেন এমন ইংরেজদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০ জন। সেই বছর জানুয়ারি মাসে ৪৬০ জন সাহেব বিভিন্ন রোগে মারা যান। (Long, Rev James (1974): Calcutta in the Olden Times: Its Localities and Its People; Calcutta: Sanskrit PustakBhandar; p.68.) আদপে সাহেবরা কি রোগে আক্রান্ত হচ্ছিলেন তা নির্ধারণ করতে পারেননি তৎকালীন ইংরেজ ডাক্তারেরা। তখন শুধুমাত্র ইংরেজদের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, এর পাশাপাশি এই শহরের মানুষদের অবস্থা কি হয়েছিল তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। ১৭১৭ সালে ফারুখশিয়ারের ফরমান হাতে পেলে কলকাতায় জাঁকিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন তারা। এরপর পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত অবশ্য কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর কলকাতায় সাহেবদের দাপাদাপি বাড়তে থাকল। ১৭৫৭ সালের ২২ শে অগাস্ট লর্ড ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির কর্তা ব্যাক্তিদের এক চিঠি লেখেন, সেখানে তিনি যথার্থ উল্লেখ করেন, "কলকাতার অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এখন দুর্গে সেনাদের রাখলে অনেকেই 'পাক্কা জ্বরে' মারা যাবে। তাই আমি তাদের কলকাতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।" ইতিহাস এবং তথ্য অবশ্য বলছে সেই বছর দক্ষিণবঙ্গে 'পাক্কা জ্বর'-এর প্রকোপ দেখা গিয়েছিল। আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা নেহাতই কম ছিল না। আসল ব্যাপার হল সেই সময় বর্ষাকালে বিভিন্ন রোগ দেখা দিত যা থেকে রেহাই পেতেন না কোন মানুষই। আবার ক্লাইভ সাহেবের চিঠির তারিখটাও ছিল তো ২২ শে অগাস্ট অর্থাৎ বর্ষাকাল। এইরকমও গল্প শোনা যায় প্রতিবছর নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ সাহেবরা মিলিত হতেন হারমোনিক ট্যাভার্নে, যা ছিল তখনকার নামকরা পানশালা। অবশ্য এর পশ্চাতে কিছু কারণও ছিল। ১৫ নভেম্বর সেখানে মিলিত হয়ে তুমুল হুল্লোড় করত সাহেববাবুরা। ভাবখানা এমন থাকত যে,এবছরের মতো তো বেঁচে গেছি।

পলাশীর পরে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যেই এক ভয়াবহ মহামারীর সাক্ষী থেকেছিল কলকাতা সহ সমস্ত বাংলা। মন্বন্তর, যা আমরা কমবেশী 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এই মহামারী ছিল মনুষ্য সৃষ্ট। ১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ দেখেছিল সবচাইতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় মৃত্যু ঘটেছিল প্রায় এক কোটি মানুষের। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তার রিপোর্টে যথার্থই উল্লেখ করেন বাংলার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিলেন।এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ি ছিলেন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তখন বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল, যার অর্থ হল প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকল নবাবের হাতে এবং রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন ইংরেজরা। তথ্য অবশ্য বলছে, ১৭৬৮ সালে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫.২১ মিলিয়ন টাকা। আবার এর পাশাপাশি ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হয় তা ১৭৬৮ সালে

আদায়ীকৃত রাজস্বের থেকে প্রায় ৫,২২,০০০ টাকা বেশি ছিল। প্রশ্ন এখানেই, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর ঠিক তার পরের বছর কিভাবে আদায় করা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল? এখান থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে রাজস্ব মুকুব করা হয়নি। তবে দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পলাশীর যুদ্ধের উত্তর পর্বে বাংলা থেকে সম্পদের নিঃসরণ ঘটতে শুরু করে। যাকে ঐতিহাসিকরা 'Post Plassey Plunder' বলে চিহ্নিত করেছেন। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটলে পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে কাঁচামাল বিলেতে রপ্তানি করা হতে শুরু করে। এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অসৎ ব্যবসা। বিভিন্ন জমিদারদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ উৎকোচ গ্রহণ করে এরা গ্রহণ করেছিল। নিজেদের রাজকোষ শেষ হতে শুরু করলে জমিদারেরা কৃষকদের ওপর অত্যাচার বৃদ্ধি করে। এই সময় কলকাতা শহর জুড়ে এজেন্সি হাউসগুলির রমরমা ব্যবসা শুরু হয়। এদের মূল কাজ ছিল কোম্পানির কর্মচারীদের অসৎ উপায় আয় করা অর্থ ইংল্যান্ডে কর্মচারীদের নির্দিষ্ট ঠিকানায় প্রেরণ করা। এই সমস্ত কারণের ফলস্বরুপ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকেই দুর্ভিক্ষজনিত বিষয়টির সূত্রপাত ঘটে। এই সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয় যা কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল। কিন্তু ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই পরিস্থিতিতেও নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত ছিলেন। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বাংলার জনজীবন। হাহাকার পড়ে গিয়েছিল সর্বত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে জাহাজ নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন জনৈক ওলন্দাজ বণিক। গঙ্গার পাড়ে অসংখ্য নর কঙ্কাল দেখে তিনি এই অঞ্চলের নাম দিয়েছিলেন 'গলগোথা'। ডাচ ভাষায় এই শব্দের অর্থ হল নরখুলি। অনেকে আবার মনে করেন এই 'গলগোথা' শব্দ থেকে 'কলকাতা' নামের উৎপত্তি কিন্তু এই বক্তব্য নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। উনবিংশ শতকের 'ইম্পেরিয়াল গেজেটে' উল্লেখ করা হচ্ছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন এক সময় পরপর সাত বছর ধরে কলকাতায় মহামারী হয়েছিল। মৃত্যুবরণ করেছিলেন অসংখ্য মানুষজন। এমনকি তাদের দাহ করাও সম্ভব হয়নি তাই ফেলে রাখা হয়েছিল গঙ্গার পাড় জুড়ে। হয়ত এই সমস্ত নরকঙ্কাল দেখেছিলেন ডাচ বণিক মহাশয়।

অবশ্য এই তথ্যের কিছুটা হলেও সমর্থন পাওয়া যায় হলওয়েল সাহেব প্রদত্ত এক বিবরণীতে।হলওয়েল উল্লেখ করছেন, "Every seventh year with scarcely any exception, thesmallpox rages epidemically in these provinces (Bengal) during the months of March,April and May, until the annual returning of rains about the middle of June put a stop of its fury ... the disease proves universally the most malignant confluent kind, from which few either of the Indians or the Europeans escaped ... commonly dying on the first, second, or third day of eruption" (Jaggi, 0. P. (1979): Western Medicine in India: Epidemics and Other Tropical Diseases; Vol. 12; Delhi: Atma Ram and Sons; p.123)

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে গুটিবসন্ত তার ভয়াবহ রূপ দেখিয়েছিল। ১৮৩০-১৮৫০ সালের মধ্যে চারবার গুটিবসন্ত দেখা দিয়েছিল এবং প্রতিবারই প্রায় ১৬ মাস জুড়ে গুটিবসন্ত স্থায়ী হয়েছিল এই শহরে। ১৮৩২-৩৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ১৬ মাস জুড়ে স্থায়ী ছিল গুটিবসন্ত এবং প্রায় এই রোগের ফলে মৃত্যু ঘটেছিল ২৮১৪ জনের। এরপর ১৮৩৭-৩৮ সালে পুনরায় গুটিবসন্ত ফিরে এসেছিল। এইবার মৃত্যু হয়েছিল ১৫৪৮ জন মানুষের। ১৮৪৩-৪৪ সালে আরো ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করে গুটিবসন্ত, সেই সময় প্রায় ৩০০০-এর কাছাকাছি মানুষমারা গিয়েছিলেন। ১৮৪৪ সালে জনৈক স্টুয়ার্ট নামে এক সাহেবের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওই বছর পার্কস্ট্রীট ডিস্পেন্সারিতে প্রতিনিয়ত প্রায় ২৮০ জন মানুষ চিকিৎসা করতে এসেছিলেন এবং এর মধ্যে ১২ জন আক্রান্ত ছিলেন গুটিবসন্তে, (Howe, G. M.(1972): Man, Environment, and Disease in Britain: A Medical Geography of Britain Through Ages; Barnes and Noble Books; p.124.)। ১৮৫০ সালে গুটিবসন্ত সবচাইতে ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছিল। ১৮৪৯-৫০ সালে মৃত্যু ঘটেছিল প্রায় ৬১০০ জনের। এরমধ্যে ১৮৫০ সালের প্রথম তিন মাসেই মৃত্যু হয় ৩২২৯ জনের (Smallpox Commissioners Report (1850); Calcutta: Military Orphan Press; p.2.)। সমসাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংখ্যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল

কেননা তখন শহর কলকাতায় আজকের মত লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করতেন না। এই রোগ মূলত মুচিপাড়া, বউবাজার এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কলুটলা, সুকিয়াস স্ট্রিট, শ্যামপুকুরের বিভিন্ন এলাকা। ধীরে ধীরে গুটিবসন্তের প্রকোপ কমতে থাকল যখন এডওয়ার্ড জেনারের আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন সর্বত্র ব্যবহার করা শুরু হল।

কিন্তু এখানেই কলকাতার বুকে মহামারীর বাড়বাড়ন্ত শেষ হয়ে যায় নি। গুটিবসন্ত শহর কলকাতায় যেমন দানা বেঁধেছিল ঠিক তার পাশাপাশি কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। লন্ডনের ব্রড স্ট্রিটের কোন এক জলের পাম্প থেকে সেই এলাকায় কলেরা ছড়াতে শুরু করে। জন স্নো নামক জনৈক ডাক্তার সেই পাম্পটি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, কেননা লন্ডনের বিভিন্ন হাসপাতালে কলেরায় আক্রান্ত যে সমস্ত রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছিল তারা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ব্রড স্ট্রিটের পাম্পটির জল পান করেছিলেন। এ অবশ্য ইংল্যান্ডের প্রেক্ষাপট। তবে কলকাতায় কলেরার সূত্রপাত দেখা গিয়েছিল ১৮১৭ সাল নাগাদ। শুধু তাই নয় ১৮১৭ সাল থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত কলকাতাসহ পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য এপিসেন্টার ছিল এই শহর। এখান থেকেই নাকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সেখান থেকে পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকাসহ ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে কলেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে যে কলেরার অতিমারি প্রথম দেখা গিয়েছিল তাকে বলা হয় 'ফার্স্ট এশিয়াটিক কলেরা প্যান্ডেমিক' বা 'এশিয়াটিক কলেরা'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ করেই কলেরা উধাও হয়ে যায়। এর পশ্চাতে অবশ্য একটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৩ সালের শেষে কলকাতায় প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছিল। মনে করা হয় সেই ঠান্ডার কারণেই ১৮২৪ সালে কলেরার বাড়াবাড়ি বন্ধ হয়। তবে এখানেই শেষ নয় কলেরা বারবার গ্রাস করেছে কলকাতাকে। পুনরায় ১৮২৬ সালে দ্বিতীয় কলেরা অতিমারি শুরু হয়েছিল। এইবারেও গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল থেকে বাণিজ্য পথ ধরে কলেরা অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই দফায় কলেরার আক্রমণ ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপরে ১৮৪৬ সালে পুনরায় কলেরার প্রকোপ লক্ষ্য করা যায়। অসংখ্যবার কলেরা ফিরে এসেছিল কলকাতায়। ১৮৬০,

১৮৮১, ১৮৯৩, ১৮৯৯ সালে কলেরার প্রকোপে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংখ্যাটাও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। শেষপর্যন্ত ১৯২৩ সালে প্রশমিত হয় কলেরার প্রকোপ।

গুটিবসন্ত, কলেরার পরে কলকাতা যে ভয়াবহ মহামারীর সাক্ষী থেকেছিল তাহল প্লেগ। যদি পৃথিবীর প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দেওয়া যায় তাহলে বলা যেতে পারে, সময়টা মোটামুটি ভাবে ৫৪১ খ্রিস্টাব্দ, যে সময়ে প্রথম জাস্টিনিয়ান বাইজানটাইন সাম্রাজ্য শাসন করছেন। তার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। এই সময় এক মারাত্মক মহামারী দেখা দেয়, যারনাম প্লেগ। এই প্লেগের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে এর নাম দেওয়া হয়েছে জাস্টিনিয়ান প্লেগ। মানে একজন সম্রাটের নাম মহামারীর আগে বসানো হয়েছে। গোটা ইউরোপ, এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা জুড়ে মৃত্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ থেকে ৫০ মিলিয়ন। প্রায় দুই শতক ধরে এই মহামারী রাজত্ব করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উধাও হয়ে গেল।এরপর প্রায় ৮০০ বছরের ব্যবধানে আরেক মহামারী দেখেছিল আমাদের পৃথিবী। যার নাম শুনলে শরীর যেন শিউরে ওঠে, ব্ল্যাকডেথ। কনস্টান্টিনোপলের পতনের প্রায় ১০০ বছর আগে ইউরোপকে তছনছ করে দিয়েছিল ব্ল্যাক ডেথ। এই কনস্টান্টিনোপলের পতনের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল যুগসন্ধিক্ষণের বিতর্ক। আজও যা ঐতিহাসিকদের চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। প্রায় সহস্রাধিক বছর ধরে চলতে থাকা বাইজানটাইন রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল, যা ইউরোপের মানচিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়। তবে আসল কথা হল এই ব্ল্যাকডেথকে নিয়ে। ব্ল্যাকডেথ-এর ভয়াবহ সংক্রমণ সর্বপ্রথম দেখা যায় ১৩৪০ এর দশকে। ক্রিমিয়ায় অবস্থিত কাফা শহরে। ১৩৪৪ সাল নাগাদ মোঙ্গলরা কাফাতে জেনোয়ার বণিকদের বন্দর অবরোধ করল। নৃশংস মোঙ্গলরা কাফা বন্দরের প্রতিরোধ ভাঙার জন্য প্লেগে মৃত মোঙ্গল সেনাদের মৃতদেহ প্রাচীরের উপর থেকে কাফা শহরে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই শহর জুড়ে প্লেগ ছড়িয়ে পড়তেশুরু করে। ১৩৪৭ সাল নাগাদ কাফা বন্দর থেকে যে সমস্ত জাহাজ ইউরোপে প্রবেশ করেছে, সেই সমস্ত জাহাজের বণিকদের থেকেই ইউরোপে ছড়াতে শুরু করল প্লেগ। প্রথমে সিসিলি তারপর একে একে ইতালি,স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ডএবং ১৩৫০ স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও বাল্টিক অঞ্চলে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের বাংলায় সর্বপ্রথমবারের মতো প্লেগ দেখা দিয়েছিল ১৫৭৩ সালে, গৌড়-এ। কলকাতায় অবশ্য প্লেগের প্রকোপ শুরু হয় উনবিংশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে, ১৮৯৫ সালে। হংকং থেকে একদল ইংরেজ সেনা কলকাতায় ফিরেছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয় কিন্তু কাউকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়নি। এই ঘটনার বছর তিনেক পরে ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে প্লেগ ছড়াতে শুরু করে। অবশ্য মনে করা হয় ১৮৯৫ সালের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার কোন যোগসূত্র ছিল না। ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি গঙ্গার পার্শ্ববর্তী ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কোন এক ছাপাখানার আশেপাশে প্রচুর ইদুর মরে থাকতে দেখা যায়। এই ঘটনার ৩-৪ দিনের মধ্যেই ওই এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। শ্যামপুকুর, কুমারটুলি, বড়বাজার, বেনিয়াপুকুর প্রভৃতি অঞ্চলে দ্রুত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে ৩০শে এপ্রিল প্লেগ রোগের সংক্রমণের কথা ঘোষণা করা হয়। এরপর এই শহর দেখেছিল মৃত্যু মিছিল। তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কলকাতার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছিল। কলকাতা ছেড়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যেতে থাকেন অসংখ্য মানুষ। এমন গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাকে ইনজেকশন প্রয়োগ করে মেরে ফেলা হয়। যখন কলকাতায় প্লেগ মারাত্মক আকার গ্রহণ করতে শুরু করেছে সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ দার্জিলিঙে ছিলেন। তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফিরে এসে নিজের শিষ্যদের নিয়ে বিভিন্ন দরিদ্র বস্তিতে প্লেগ আক্রান্তদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল বিবেকানন্দ ঠিক করেছিলেন বেলুড় মঠ-এর জন্য নির্ধারিত জমি বিক্রি করে সেখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্লেগ রোগীদের সেবা করবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জমি বিক্রি করতে হয়নি। সমসাময়িককালের একজন প্রখ্যাত ডাক্তার ছিলেন রাধাগোবিন্দ কর। তিনি একসময় উল্লেখ করছেন, ‘একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগী পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধুলিধূসর কাষ্ঠাসনে একজন য়ুরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা। উনিই ভগিনী নিবেদিতা।’ আসলে ভগিনী নিবেদিতা নিজেও বিবেকানন্দের সঙ্গে সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সরকার একটি ‘প্লেগ কমিশন’ গঠন করেছিলেন। এই কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল

(‘Plague Report’ 1898 - 1908) ১৯০১ সালের সেনশাসে অনুযায়ী কলকাতায় যে সংখ্যক জনগণ বসবাস করতেন তার ৬.৪% মানুষ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, শুধু তাই নয় যত সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৯৪% মানুষের মৃত্যু হয়েছিল (Pearse, T. F. (1908): Report on Plague in Calcutta-for the year ending 30th June, 1908; Calcutta: Bengal Secretariat Press.)। এই পরিসংখ্যানই বুঝিয়ে দেয় প্লেগ রোগ কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। ১৯১১ সালের সেনশাসে লক্ষ্য করা যায় কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। তার একমাত্র কারণ জন্ম- মৃত্যুহার সমান ছিল। প্লেগ, কালাজ্বর, কলেরা, কুষ্ঠ ম্যালেরিয়ায় প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু একসময় প্লেগ রোগের ভয়াবহতা নিয়ে চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সেই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, “পলাতক প্লেগের অনুগ্রহে। আমার একজন ভৃত্য ছুটি লইয়া একদিন বড়বাজার গিয়াছিল। সেখান হইতে আসিয়া একদিন পরেই প্লেগ হয়। আর ৩০ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু। বাড়ি ছাড়িয়া উক্ত ঠিকানায় আছি- কতদিন পলায়ন চলিবে জানি না।” স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্লেগ রোগের জন্য হাসপাতাল তৈরীর কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সেই সময়কার বীভৎসতার রূপ দেখে ঠিক থাকতে পারেননি তিনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “ম্যালেরিয়া-প্লেগ-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষমাত্র, তাহারা বাহ্য লক্ষণমাত্র - মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।”

প্লেগের পর কলকাতা সাক্ষী থেকে ছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের। কলকাতায় অবশ্য এই জ্বরকে বলা হত ‘Bombay fever’। ১৮৯০-এর দশকে প্রথম বোম্বে শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে একবার নয় তিন তিনবার ইনফ্লুয়েঞ্জা গ্রাস করেছিল কলকাতাকে। প্রথমটা ছিল ১৯১৮ সালের জুন মাসে, যা মোটামুটি ভাবে জুলাই মাস পর্যন্ত চলেছিল। এরপরে ওই বছরের অক্টোবর মাসে পুনরায় ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর ফিরে আসে এবং এক্ষেত্রে পরের বছর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই জ্বর তার ভয়াবহতা দেখিয়েছিল। কলকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর শেষবারের মত লক্ষ্য করা যায় ১৯১৯ সালের মে মাসে কিন্তু এই সময় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ পূর্বের মত অতটা ভয়াবহ ছিল না। পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু এর এপিসেন্টার কোথায় ছিল তা নিয়ে অবশ্য মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকেই এই

ইনফ্লুয়েঞ্জাকে স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। কলকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অতুল সুর তার 'শতাব্দীর প্রতিধ্বনি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, এত মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল শ্মশানে দাহ করা জায়গা পাওয়া যায়নি। গঙ্গার পাড় জুড়ে সারি সারি মৃতদেহ রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ এই রোগের ভয়াবহতা যে মারাত্মক ছিল তা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না।

১৯৩৪ সাল, কলকাতায় আরো এক নতুন রোগ দেখা দিল। আমাদের শহরের লোকজন এই রোগের নাম দিয়েছিল ঝিনঝিনিয়া রোগ। ডাক্তারি পরিভাষায় এই রোগের নাম কি তা জানা যায়নি। এই রোগ ছিল এক অদ্ভুত প্রকৃতির, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে শরীর ঝিনঝিন করে উঠল। ধপ করে রাস্তায় পড়ে গেল এবং যখন আশেপাশের লোকজন তাকে তোলার জন্য এগিয়ে আসতেন ততক্ষণে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে গেছে। কলকাতার অবস্থা এমন হয়েছিল মানুষজন ঘর থেকে বাইরে বেরোলে পকেটে একটি চিরকুটে নিজের নাম ঠিকানা লিখে রাখতেন, পাছে রাস্তায় মৃত্যু ঘটলে যাতে বাড়ির লোকজন খবর পায় কারণ তখন তো আজকের মত হাতে হাতে মোবাইলের চল ছিল না বা পকেটে পরিচয় পত্র রাখাও থাকত না।

এরপর কলকাতা দেখেছিল আরো এক মন্বন্তর, যা ইতিহাসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে খ্যাত। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বাংলা জুড়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। অবশ্য এই দুর্ভিক্ষ মনুষ্য সৃষ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন খাদ্যশস্যের অভাব মারাত্মক আকার গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে জাপানি সৈন্যবাহিনী মায়ানমার দখল করেছিল। ইতিহাস আবার বলছে বার্মা বা আজকের মায়ানমার থেকে তৎকালীন সময়ে চাল আমদানি করা হত। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন রয়েছে। সমগ্র বাংলা জুড়ে যে পরিমাণ চাল উৎপাদিত হত, তা নিঃসন্দেহে বাংলায় বসবাসকারী জনগণের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। অনেকে আবার এই দুর্ভিক্ষের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে দায়ী করে থাকেন। কারণ তার ভ্রান্ত নীতিই এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী ছিল বলে মনে করা হয়। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর জন্য সরকার প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত করেন। এর ফলেই সমগ্র বাংলা জুড়ে খাদ্যশস্যের হাহাকার পড়ে যায়। ভারতে অবস্থানরত ব্রিটিশ আধিকারিকরা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে খাদ্যশস্যের জন্য বারবার আবেদন করলেও সেই দিকে তিনি কর্ণপাত করেননি বলে

একাধিক ঐতিহাসিক মত ব্যক্ত করেছেন। সমসাময়িককালের বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় প্রায় কলকাতাসহ সারা বাংলা জুড়ে ৩০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল এই দুর্ভিক্ষে। সামান্য খাদ্যশস্যের জন্য যারা কলকাতা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই মাঝপথে মৃত্যুবরণ করে। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাড় করিয়েছিল। সেদিনের শহর কলকাতা দেখেছিল খাদ্যের অভাবে সারি সারি মানুষের লাশ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে।

এরপর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। দেশে যেমন নতুন সরকার স্থাপন হয়েছে ঠিক তার পাশাপাশি আমাদের রাজ্যেও এক নতুন সরকার স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। খাদ্যশস্যের দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল সারা বাংলা জুড়ে। সর্বত্র খাদ্যশস্যের জন্য এক হাহাকার সৃষ্টি হয়ে যায়। বামপন্থীদের নেতৃত্বে গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতার দিকে রওনা হয়েছিল নিজেদের হকের দাবিতে, খাদ্যের দাবিতে। সালটা ১৯৫৯, আর দিনটা ৩১ শে আগস্ট..................

বাকিটা আমাদের সকলের জানা।

তথ্যসূত্রঃ

Bose, K.C.(1920): “Epidemic Influenza in and around the city of Calcutta”; Indian Medical Gazette; Vol. 55

Howe, G. M.(1972): Man, Environment, and Disease in Britain: A Medical Geography of Britain Through Ages; Barnes and Noble Books; p.124

Jaggi, 0. P. (1979): Western Medicine in India: Epidemics and Other Tropical Diseases; Vol. 12; Delhi: Atma Ram and Sons; p.123

Long, Rev James (1974): Calcutta in the Olden Times: Its Localities and Its People; Calcutta: Sanskrit PustakBhandar; p.68

Pearse, T. F. (1908): Report on Plague in Calcutta- for the year ending 30th June, 1908; Calcutta: Bengal Secretariat Press

Smallpox Commissioners Report (1850); Calcutta: Military Orphan Press; p.2

সুর, অতুল - শতাব্দীর প্রতিধ্বনি

ঘোষ, বিনয় - কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৫

পত্রী, পূর্ণেন্দু - পুরোনো কলকাতার কথাচিত্র

প্রবন্ধ

অন্ধকারে বন্ধঘরে থাকবো না

তপন মিশ্র

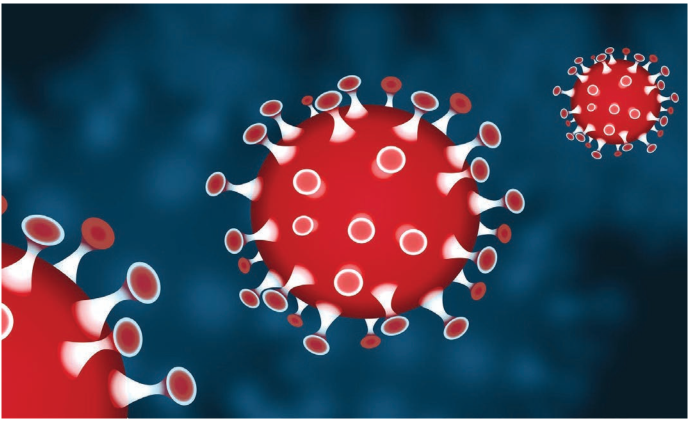

কেউ কেউ এমন ভাব করছেন যেন পৃথিবীতে কোনোদিন করোনা ভাইরাস ছিল না। যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই ভাইরাসকে 'চায়না ভাইরাস' বলে নামাঙ্কিত করেন তাহলে রাম, শ্যামে কি ত্রুটি বলুন। ট্রাম্প যে জানতেন না একথা বলবো না। জেনেশুনে একটি দেশ বা জাতিকে দোষারোপ করা এদের স্বভাব।

করোনা কথাটির অর্থ হল 'মুকুট'। এই ভাইরাসের উপরের আস্তরণের প্রোটিন এবং কিছুটা ফ্যাট মুকুটের মতো সজ্জিত থাকে। আপনি আমি এই মুকুট দেখতে পাবো না। ভাইরাসের আকার এতই ক্ষুদ্র যে সাধারণভাবে আমাদের বিজ্ঞানাগারে যে মাইক্রোস্কোপ থাকে তাতে এই পদার্থ দেখা যায় না। দেখতে হলে চাই বিশেষ ধরনের মাইক্রোস্কোপ যার নাম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। এই মাইক্রোস্কোপে আলোর ব্যবহার হয় না এবং সে জায়গায় হয় ইলেকট্রন ব্যবহার।

আজকাল আরও উন্নত পদ্ধতি বা ইলেকট্রন টোমোগ্রাফির ব্যবহার করে আরও ভালো করে ভাইরাসের ছবি পাওয়া যায়।

হঠাৎ একটি ভাইরাসের আক্রমণে বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের একটু ভুল হচ্ছে। পৃথিবীর কিছু মানুষ আছেন যারা বিজ্ঞানের পদ্ধতির বিরোধী কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছপা হন না। এরা এই অন্ধকারময় দুঃসময়ের স্থায়িত্ব চান। অন্ধকারে যদি অনেক মানুষ ভিত হয়ে বন্ধ ঘরে থাকেন তাহলে অনেক কালাকানুন বলবৎ করা যায়। অন্ধকারের কারণ হল একদিকে সঠিক তথ্য না পাওয়া এবং অন্যদিকে ভয়ের বাতাবরণ। রাষ্ট্রশক্তি এই ভয়ের অপেক্ষায় থাকে। ভয়ের আবহে কেমন সচতুরভাবে দেশের স্বনির্ভরতা মৃত্যুঘণ্টা দেশের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বাজিয়ে দিলেন তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

২০০৩-এ SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) করোনা ভাইরাস চীনের গুয়াঙডঙ থেকে শুরু হয়। ২০১২ সালে দক্ষিণ আরব অঞ্চলে MERS (Middle East Respiratory Syndrome) করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। কখনও বাদুড় আবার কখনও গৃহপালিত উট থেকে ভাইরাস মানবদেহে ছড়ানোর খবর পাওয়া যায়। এই ভাইরাসগুলিকে যথাক্রমে SARS-COV এবং MERS-COV বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়াতে নিপা (Nipah) এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশকে সংক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এই ভাইরাস ও শুকর ইত্যাদি প্রাণী থেকে সংক্রামিত হয়। HIV (Human Immunodefilucy Virus) কোনো এক সময়ে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শিম্পাঞ্জির মধ্যদিয়ে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। এখন আমেরিকায় এই ভাইরাসের সংক্রমণ সর্বাধিক। অতীতে অনেক রোগ সুদূর ইউরোপ থেকে ভারতে সংক্রমিত হয়েছে। ভাইরাসের কোনো জাত নেই, দেশ নেই, বা স্থান নেই। তাই কোনো একটি ভাইরাসের জন্য যারা একটি দেশকে দায়ী করে, বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র মতো প্রতিষ্ঠানকে নড়বড়ে করার চেষ্টা করে তাদের মুখে বিশ্ব মানবতা তো দূরের কথা, বিশ্বাতীত বাজার ব্যবস্থাও কেবল মুনাফার জন্য অর্থবহ।

পৃথিবীর প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা পত্রিকা এবং তার সঙ্গে জৈবপ্রযুক্তি বিজ্ঞানী, ভাইরোলজি ইত্যাদির গবেষকরা

তথ্যের আদান প্রদান ও সংহতির জন্য আবেদন করছেন। এমন একটি বিখ্যাত গবেষণা পত্রিকা হল "নেচার মেডিসিন" (Nature Medicine)। পত্রিকাটি পৃথিবীর সমস্ত গবেষকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে যে যেখানে যাঁরা এই সংক্রান্ত গবেষণা করছেন তার তথ্যের আদানপ্রদান যতশীঘ্র সম্ভব করুন। আবেদনটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় ১২৫টি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্বাক্ষর করেছে। পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীদের এই আহ্বান রাষ্ট্রনায়কদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না কেন?

ল্যান্সেট পত্রিকার উপরিলিখিত প্রবন্ধটিতে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এই অর্থে গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। উহানে ৪১ জন রোগের উপর গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এই তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেছেন। গবেষকরা বলছেন এদের মধ্যে ২৭ জন সরাসরি হুনান সি ফুট মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই এই তথ্যের ভিত্তিতেই এই বাজার ১লা ডিসেম্বর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। রোগীদের সাধারণ সমস্যা ছিল নিউমোনিয়া। এই ৪১ জনের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয় এবং বাকিরা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে যায়। তবে এই গবেষণাপত্রে 2019-nCOV অর্থাৎ বর্তমানের করোনো রোগের নিরাময়ের নির্দিষ্ট পদ্ধতি বলা সম্ভব হয়নি।

ল্যানসেট আর একটি আবেদনও প্রকাশ করেছে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২০-তে। আবেদনটি বিশ্ববাসীদের কাছে। আবেদনটি স্বাক্ষর করেছেন আমেরিকা, জার্মানি, স্পেন, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানী, গবেষকরা। ওঁরা শুরু করছেন "We sign this statement in solidarity with all scientists and health during the challenge of the COVID-19 outbreak." পৃথিবী সমস্ত দেশের সামনের সারির বিজ্ঞানীদের চীন দেশের চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের বিশ্ব স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি ওঁদের অবদানের জন্য সংহতি জ্ঞাপনের বার্তা এক গুরুত্বপূর্ণ সংহতি। যখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী "Social distancing" সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কথা বলছেন তখন সংহতির বার্তা দিচ্ছেন বিজ্ঞানারা। তাঁরা আরও বলছেন এই ভাইরাস (COVID 19)-এর গবেষণাগারে তৈরি কোন জীবানু নয় বরং প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট। তাঁদের ভাষায় "Conspiracy theory do not but create fear, remorse and prejudice that jeopardise our global

collaboration” কোন এক দেশের ষড়যন্ত্র বা অভিসন্ধিমূলক কাজের তত্ব বিশ্বের গবেষক বিজ্ঞানীদের মধ্যে সংহতির পরিবেশকে নষ্ট করে। ফলে তাঁদের আহ্বান এধরণের গুজব বর্জনীয়।

অত্যন্ত ক্ষুদ্র অবয়বের জন্য ভাইরাস নিয়ে আমাদের জ্ঞান সীমিত। জীব বিবর্তনের ভাইরাসের ভূমিকা কতোটা তা স্পষ্ট না হলেও জীবসৃষ্টির আদিম অবস্থায় যে ভাইরাস অবস্থান করতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাইরাসের কোন কোষ নেই, বিপাক ক্রিয়া নেই অর্থাৎ তার খাদ্য, জল, অক্সিজেন বা প্রজননের জন্য জীবন সঙ্গী।

অধিকাংশ ভাইরসই ‘host speufir’ অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি জীবের মধ্যে বেঁচে থাকে। একটি জীবিত কোষের বাইরে সে মৃতবৎ আচরণ করে এবং কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন সক্রিয় থাকতে পারে। একবার উপযুক্ত জীবকোষ পেলে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যে অসংখ্য হয়ে যেতে পারে। এই দেহে মূলত প্রোটিন এবং একটি নিউট্রিক অ্যাসিড যেমন ডি এন এ বা আর এন এ থাকে। করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে আর এন এ হল প্রাণ ভোমরা যার উপর প্রোটিনের আবরণ থাকে। এই প্রোটিনের ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা ফ্যাট থাকায় আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুলে হাতের ভাইরাসের গঠন ভেঙ্গে মৃত্যু হয়। অর্থাৎ নিস্ক্রিয় হয়ে যায়। জীবনের একমাত্র যে গুণ এর মধ্যে আছে তা হল উপযুক্ত জীবকোষ পেলে তার মধ্যে আধিপত্য স্থাপন করে নিজের মতো লক্ষ কোটি ভাইরাস তৈরী করার ক্ষমতা। যেহেতু জিনের মধ্যে থাকা তথ্য (genetic information) সে সঠিক ভাবে বহন ও তার অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে তাই জীবনের জালে (web of life) এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেহেতু ভাইরাসের কোন বিপাক ক্রিয়া নেই তাই তার দেহে ‘অ্যান্টিবায়োটিক’-এর মাধ্যমে বিষ ঢুকিয়ে মেরে ফেলার উপায় নেই। অ্যান্টি ভাইরাল যে সময় ঔষধ তৈরি হচ্ছে তা মূলত প্রতিলিপি তৈরীর প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করা। এই কাজ তেমন দক্ষ ভাবে এখনও করা যায়নি। তাই একমাত্র ভরসা প্রতিষেধক তৈরি করা।

দীর্ঘদিন ধরে আর এন এ ভাইরাস যেমন COV বা করোনা ভাইরাস সম্পর্কে গবেষণা পৃথিবী জুড়ে চলছে। উহানের ভাইরোপোজি গবেষণাগারেও চলছিল। তবে কেরোনা ভাইরাস মানেই কোভিড-১৯ সম্পর্কে কাজ চলতিল তা নয়। SARS এবং MERS সম্পর্কে

একাজ বিশ্বজুড়ে চলছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ২০১১ সালে Pubmed নামে এক বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকায় আমেরিকার ন্যাসভিল এর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা করোনা ভাইরাস-এর আর এন এ প্রতিলিপি তৈরির প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণের গবেষণালব্ধ কিছু ফল প্রকাশ করেন। আরও অনেক কাজ বিশ্বজুড়ে হয়। মোদ্দা কথা হল ভাইরাস বিশেষ করে করোনার মতে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আর এন এন প্রতিলিপি তৈরীর সময় অসংখ্য ভুল হয়। ডি এন এ প্রতিলিপি তৈরীর সময় কোষের মধ্যে প্রুফ রিডিং-এর ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এই আর এন এ-র ক্ষেত্রে তা থাকে না। ফলে এই ভুলভ্রান্তিগুলি শোধরানোর ব্যবস্থাও থাকে না। প্রতিনিয়ত আর এন এ ভাইরাসের মধ্যে জিনের হঠাৎ পরিবর্তন বা মিউটেশন (Mutation) হয়ে চলেছে। এরমধ্যে এমন কিছু মিউটেশন ঘটেযায় যা সার্স, মার্স বা যে কোন ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভাইরাসকে কোভিড-১৯ এর মতো ভয়ঙ্কর ভাইরাসে পরিণত করতে পারে।

২০১৭ সালে ইভল্যুসন (Evolution) পত্রিকায় এক গবেষণা প্রবন্ধে পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে ভাইরাসের মিউটেশনের মিল অর্থাৎ ধনাত্মক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় (Dynamics of Molecular evolution in RNA Virus populations depend on Sudden Versus gradual environmental change) [লেখক মোর্লে এবং টর্নর]। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন, বিশেষ করে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

করোনার অন্ধকার আসলে আমাদের মনের। শুধু গৃহবন্দি হয়ে থেকে সামাজিক দূরত্ব বাড়িয়ে ফেললেই সমস্যার সমাধান হবে না। সতর্কতার সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার লড়াই আমাদের লড়তে হবে। পরিবেশ রক্ষার লড়াই বাজারী অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের আদিম লুঠের বিরুদ্ধে লড়াই। এই রাষ্ট্রশক্তি চায় অন্ধকার জিইয়ে রাখতে। তাই দীর্ঘায়িত লকডাউন এবং উপেক্ষিত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরে রাষ্ট্র এখন নির্ভরশীল। বামপন্থা তাই ব্যতিক্রম।

গল্প

তেংনাদা কথা

সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রির অন্ধকারের রেশ এখনও যেন ঠিক মতো কাটেনি। চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে। তারই সামান্য আবরণ সরিয়ে তেংনাদা গ্রামে সবে যেন ভোরের একটা অস্পষ্ট আলো দেখা দিয়েছে। প্রকৃতিরও এখনও যেন ঘুম ভাঙেনি। সে যেন রাতের কাঁথা গায়ে এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পাখিদের অবস্থা অবশ্য তা নয় – অনেকক্ষণ আগেই তাদের ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভাঙা চোখে তারা যেন কিচির মিচির করে ডেকে উঠছে, কিন্তু এখনও বাসা ছেড়ে বার হয়নি। এই সময়কেই

বোধহয় উষা বলে – বলে ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা, সেই হল আসল উষা!

এই উষাকাল কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিছুক্ষণ পরেই অস্পষ্ট আলো একটু স্পষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এক আশ্চর্য নীল রঙ ছড়িয়ে দেয়। পাখিরাও সব এক সাথে কলরব করে আকাশে ডানা মেলে। রাস্তার ধারের গাছগুলো সব তিরতিরিয়ে মাথা দোলায়। প্রকৃতি যেন এবারে আড়মোড়া ভেঙে বিছানা ছেড়ে নেমে আসে। নীল আলোকে পেছনে ফেলে পুব আকাশ একটু একটু করে লাল হয়ে ওঠে। ভুটান পাহাড়ের আড়াল থেকে হঠাৎই লাল গোলার মতো নবীন সূর্য বেরিয়ে আসে। তারই রক্ত রাঙা আলোতে সব কিছু মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে যায়। রাতের জড়তা কাটিয়ে তেংনাদা গ্রামও আবার জেগে উঠে নতুন একটা দিনের সূচনা করে!

তবে আজ কিন্তু এই গ্রামেরই সদর পাড়ার গাম্বা নিউসেনের বাড়ির পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা – সেখানে এক জমাট বাঁধা উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে এরই মধ্যে সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। আরও ভাল করে বলতে গেলে গতকাল শেষ রাত থেকেই ওরা সবাই জেগে আছে।

এই ওরা সবাই বলতে কিন্তু বেশি কেউ নয় – মাত্র তিনজন। বাড়ির কর্তা গাম্বা, মোনা আর নির্মা। তবে গাম্বা অবশ্য এখন বাড়িতেই নাই – ভোরের আলোর রেশ দেখা দিতে না দিতেই বুড়ো নবরুর কাছে গিয়েছে। নির্মাই ওকে জোর করে পাঠিয়েছে।

নবরু এ গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ – গ্রামের ছোলগে – মানে মুখিয়া। গ্রামের যে কোন ব্যাপারে বিধান বা নিদান দেবার এক মাত্র অধিকারী। একটু আধটু কবিরাজীও করে – অসুখ-বিসুখে জড়িবুটিও দেয়। তবে রোগ বেশি বুঝলে পাশের গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে বলে। গাম্বা কিন্তু এই মুহূর্তে কোন বিধান নিতে নয় – মোনার জন্যে জড়িবুটি আনতে বুড়োর কাছে গিয়েছে – মোনা গতকাল রাত থেকে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকবার বমি করেছে – সঙ্গে কেমন যেন একটা ছটফটানিও আছে!

জেগে বসে আছে নির্মাও। চিন্তিত মুখে মোনার পাশে বসে আছে। সঙ্গে নানাভাবে সেবা করে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। কখনও আবার উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে এটা ওটা নিয়ে এসে টোটকার মতো করে মোনাকে খাইয়ে ওর বমিটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। আর খুব

উদ্বিগ্ন চোখে ঘন ঘন বাইরের দিকে তাকিয়ে গাম্বার ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মোনা আরও একবার বমি করল – নির্মার গায়েই করল – পুরোটাই একেবারে জল। তারপর খুবই অবসন্নভাবে ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়ল। নির্মা তাড়াতাড়ি একটা চাদর এনে পেতে দিতে গেল, কিন্তু সুযোগ পেল না। বদলে আচমকাই কী যেন একটা ভেবে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল।

হঠাৎই ওর বুকের ভেতরটা এক অজানা আশংকায় যেন ধ্বক ধ্বক করে উঠল। ও কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে মোনার দিকে তাকিয়ে থেকে কী যেন একটা বোঝার চেষ্টা করল। শেষে খুবই উৎকণ্ঠিত ভাবে গলাটাকে একদম খাদে নামিয়ে প্রায় ফিস ফিস করেই মোনাকে কী যেন একটা জিজ্ঞেস করল।

মোনাও এতক্ষণ চোখ বুঁজেই শুয়েছিল। নির্মার কথা শুনে একবার চোখ খুলে তাকাল। তারপর হঠাৎই সলজ্জ ভাবে ঘাড়টা একটু হ্যাঁ-এর মতো করে নাড়িয়েই আবার চোখদুটো বন্ধ করে নিল!

মুহূর্তেই নির্মার মনটা যেন রোশনাই করে উঠল। এক বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে ওর চোখদুটো যেন হীরের দ্যুতির মতো ঝকমক করতে লাগল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তা যেন বিষণ্ণতার আবরণে ঢাকা পড়ে গিয়ে বুকের ভেতর থেকে চাপা এক দীর্ঘশ্বাস হয়ে ঝরে পড়ল। ও এবারে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। কোন রকমে নিজেকে সামলে বিমূঢ় ভাবে মাথা নিচু করে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়াল!

দুই

মোনা আর নির্মা দুই বোন, আবার একে অপরের সপত্নী – দুজনেই গাম্বা নিউসেনের বিবাহিত স্ত্রী। নির্মা প্রথম – মোনা দ্বিতীয় পক্ষ!

এটা অবশ্য তেংনাদা গ্রামে তেমন কিছু একটা নতুন ঘটনা নয়। বরং আর পাঁচটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনার মতোই একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার!

তেংনাদা বাংলার উত্তর পূর্ব কোণে ভারতের শেষ প্রান্তে ভুটান পাহাড় লাগোয়া এক উপজাতি অধ্যুষিত ছোট্ট একটা গ্রাম। বিখ্যাত শিয়ালকাটা জঙ্গলের উপকণ্ঠে, মোতিঝারি ঝিলের একেবারে কোল ঘেঁষে। গভীর বনানী আর ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুদের বাসস্থানের খুবই কাছে!

এ গ্রামে এক বিরল জনজাতির বাস। চেহারায় তাদের স্পষ্ট মোঙ্গলিয়ান ছাপ। খর্বকায়, শক্তিশালী, টকটকে ফরসা রঙ, ছোট ছোট নীল চোখ। নাক কান মুখও পাহাড়িয়াদের মতোই চ্যাপটা। কথাও বলে বিচিত্র এক পাঁচমেশালী ভাষাতে।

এরা জাত জিজ্ঞাসা করলে সাঁইপুত বলে। অদৃশ্য এক সাঁই-এর পুজো করে। নিজেদের তাঁর সন্তান বলে মনে করে। চার বেলা নামাজ পড়ে। রমজানের উপবাস থাকে। মহরমে লাঠি খেলে, ঈদে কুরবানি দেয়। আবার হিন্দুদের মতো মূর্তি পুজোও করে। বিশেষ করে মনসার পুজো!

বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় – দামি দামি গাছ কেটে চোরা চালান করে। পশু পাখি শিকার করে – সাপ ধরে। শহরে গিয়ে ঐ সব পশুদের চামড়া আর সাপের বিষ বিক্রি করে। সাপ নিয়ে নিয়ে খেলাও দেখায়!

হাতিকে মহাকাল বলে। পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। ওদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে জঙ্গলের মধ্যে বড় মন্দানী গাছের তলায় হাতিদের দেবতা ক্ষেত্রপালের মূর্তি বানিয়ে পুজো করে। পুজোর শেষে সিঁদুর মাখানো কাপড় গাছের ডালে বেঁধে দেয়। বলে দূর থেকে ঐ কাপড় দেখলেই হাতির পাল অন্য পথ ধরে।

অবসর সময়ে দূর দূর গ্রামে গিয়ে পরের জমিতে চাষ করে – ফাই ফরমাসও খাটে। সুযোগ পেলেই চুরি করে। ধরা পড়ে জেলে যায়। আবার মেয়াদ কাটিয়ে গ্রামে ফিরে আসে!

বাড়িতে মদ বানায় – চোলাই মদ। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে সেই মদ বিক্রি করে আসে। নিজেরাও প্রচুর মদ খায় – মাতাল হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। অনেক সময় খুনোখুনিও হয়ে যায়। তখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গ্রাম ছেড়ে ফেরার হয়ে পড়ে। কখনো কখনো অনেক পরে ফিরে আসে, কখনো আবার চিরকালের মতোই হারিয়ে যায়!

দুটো তো বটেই অনেক সময় তারও বেশি বিয়ে করে। সাধারণত সব বৌদের নিয়েই এক ছাদের তলায় বাস করে। কখনো আবার সবাইকে ছেড়ে তাদেরই একজনকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধে!

মেয়েরাও কম যায় না – তারাও সাপ ধরে – খেলা দেখায়। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেশা করে। নিজেদের মধ্যে গান বাজনা করে। আঁটসাট পোশাক পরে। অন্য গ্রামে গিয়ে নিত্য নতুন

ছলাকলা দেখিয়ে সেখানকার পুরুষদের বোকা বানিয়ে সর্বস্য কেড়ে নেয়। কিন্তু কখনোই নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দেহ স্পর্শ করতে দেয় না!

আবার কোন কারণে সেই স্বামী পছন্দ না হলে অবলীলায় তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের ঘরে গিয়ে ওঠে। পুরানো সব কিছু ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে সংসার শুরু করে। এতে কেউ কিছুই মনে করে না – বরং ওদের সমাজে এই ঘটনাটাকে খুবই স্বাভাবিক বলেই জানে!

সিঁথিতে এরা সিঁদুর পরে, হাতে ত্রয়োতির চিহ্ন হিসাবে লোহার বালা রাখে। কিন্তু মারা যাবার পর চিতায় নয় – কবরে গিয়ে ঢোকে। বাড়িতে বেতের কাজ করে। মোড়া বানায় – অনেক ধরণের শৌখিন ঝুড়ি বোনে। দেশে তো বটেই, এদের হাতের বেতের কাজের চাহিদা বিদেশেও প্রচুর। সে সব জিনিস দল বেঁধে শহরে গিয়ে মহাজনদের কাছে বিক্রি করে। সেই পয়সায় রঙিন চুড়ি কেনে, চোখে কাজল দেয়, পায়ে আলতা পরে। মাথার তেল আর গুচ্ছের সুগন্ধি পান মশলা কিনে আনে। তবে ইদানিং ঠোঁটের রঙ, গায়ের পাউডার আর শৌখিন সাজ পোশাক কেনার একটা হিড়িক বেড়েছে।

কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই জনগোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা খুব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে পুরুষ। আনুপাতিক হারে পুরুষদের সংখ্যা নারীদের সংখ্যার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। কমতে কমতে গোটা গ্রামটাই এখন মাত্র ষাট পঁয়ষট্টি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। সমীক্ষকরা বলছেন, এইভাবে কমতে থাকলে অচিরেই এই জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গিয়ে ইতিহাসের অন্তরালে হারিয়ে যাবে!

এই নিয়ে চিন্হিত তেংনাদা গ্রামের প্রতিটা মানুষও। তাই ওদের কোন নারী গর্ভবতী হয়ে পড়লে গ্রামে একটা খুশির হাওয়া ওঠে। ছেলে বুড়ো সবাই তখন তার শরীর স্বাস্থ্যের ওপরে নজর রাখে। আর সে সন্তান যদি পুরুষ সন্তান হয়, তবে তার জন্মের পর গ্রামে তিন চার দিন ধরে উৎসব চলে। বোধহয় এই সব কারণেই সাঁইপুত সমাজ তাদের নারী পুরুষদের এমন মুক্ত যৌনচারকে স্বীকৃতি দিয়েছে!

তিন

নির্মার সঙ্গে যখন গাম্বার বিয়ে হয় তখন গাম্বার বয়স মাত্র পনেরো আর নির্মার কুড়ি। ইতিমধ্যেই ওর তখন পাঁচ বছর জোনপের সঙ্গে বিবাহিত জীবন পার করা হয়ে গেছে। কিন্তু সাঁইপুতদের জন্মহার

হ্রাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যেন তখনো ওদের কোন সন্তানাদি হয়নি।

ছেলে হিসাবে জোনপে কিন্তু খুবই ভাল। আর পাঁচজন সাঁইপুতের মতো মাতাল বা হুল্লোড়ে নয়। তাছাড়া তখনকার ছোলগে মেন্দিকের একমাত্র নাতি। অনেক জমি জমার মালিক। তাই গ্রামের বাইরে গিয়ে পরের জমিতে নয়, নিজেদের জমিতেই চাষ করে। শিকার করা – সাপ ধরা, এসব একদমই পছন্দ করে না। বদলে খুব ভাল বাঁশি বাজায় – পাতার বাঁশি। দুটো মন্দানী পাতাকে আঙুলে মুড়ে নিয়ে ফু দিয়ে তাতে সুর তোলে। সারাক্ষণ ঐ সুরেই যেন মাতোয়ারা হয়ে থাকে। গ্রামে তো বটেই – বড় বড় শহরেও অনেক পালা গানের সঙ্গে বাজাতে যায়!

কিন্তু এমন ভদ্র, সভ্য, নরম ধাঁচের পুরুষ নির্মার মোটেই পছন্দ হয়নি। ও যেন তাই অনেকদিন ধরেই পছন্দ মতো মনের মানুষের সন্ধানে ছিল। হঠাৎ সেটাই যেন গাম্বার মধ্যে খুঁজে পেল!

গাম্বা তখন সদ্য দু'বছর জেল খেটে গ্রামে ফিরে এসেছে। অন্য গ্রামে কাজ করতে গিয়ে ওখানকার এক বাড়িতে চুরি করে ধরা পড়েছে।

জেলের এই দু'বছরে ওর চেহারায় তখন বিপুল পরিবর্তন এসেছে। চট করে দেখলে আগের গাম্বা বলে চেনাই যায় না। নাকের নিচে গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নাকটাও যেন পরিপূর্ণতা পেয়ে দৃঢ় হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোতেও আগের ভাসা ভাসা ভাবটা আর নাই। বদলে যেন ধারালো ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। হাত পায়ের কোমলতায় অনেক কাঠিন্য এসেছে, গলার স্বরটাও রিনরিনে ভাব ছেড়ে হঠাৎই যেন ভারী হয়ে উঠেছে।

ঝাঁকড়া চুল, সরু কোমর আর মেদহীন অবয়বে এই দু'বছরে কে যেন অদৃশ্য জাদু কাঠিতে ওর আগের সেই ছেলেমানুষি চেহারাটাকে ভেঙেচুরে শক্তপোক্ত বুনো পুরুষালী করে তুলেছে!

মুগ্ধ হল গাম্বাও। বয়ঃসন্ধিকালে নির্মার মতো ভরা যুবতীর প্রবল শরীরী আকর্ষণে আলোর পতঙ্গের মতো প্রায় ছুটে এসে সাগ্রহেই ধরা দিল!

দুজন দুজনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, একে অপরের শরীরী আকর্ষণের তাপ নিতে ঝাঁপ দিয়েছে, তবুও কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। নির্মা ছেড়ে আসার পরে পরেই গোটা সাঁইপুত সমাজকে

কিছুটা স্বস্তি দিয়ে জোনপের অন্য দুজন বৌ-এর কোল জুড়ে বাচ্চা এসেছে। তার মধ্যে একজন আবার পুরুষ সন্তান!

তবু তার জন্যে গাম্বা বা নির্মার মধ্যে যে কোন হতাশা বা ফাটল দেখা দিয়েছে তা কিন্তু নয়। বরং এই দুই নরনারী সময়ের সাথে সাথে নিজেদের যেন আরও শক্ত বাঁধনে বেঁধে আস্টে পিস্টে জড়িয়ে ধরেছে!

কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রথম ধাক্কা খেল নির্মাদের বিয়ের প্রায় তিন বছর পরে, গ্রামের ছোলগে নবরুর এক বিধানে। নবরুই বিধান দিল, নির্মাকে ডেকে বলল, 'তু কেয়া আপনাই সব্বই খাদ্য খাইবিস? তেরো যদি ফল না ফলে তো অন্য চারা লাগানু দে। মর্দকো ফেরি বিয়া করনে দে।'

প্রথমটায় গাম্বা কিন্তু এ নিদান মানতে চাইল না। ছোলগের কাছে গিয়ে দরবার করল। নিদান ফিরিয়ে নেবার জন্যে অনেক অনুনয় বিনয় করল। কিন্তু নবরুর সেই একই কথা। তেংনাদা গ্রামে থাকতে গেলে – সাঁইপুত সমাজকে টিকিয়ে রাখতে গেলে – এ বিধান গাম্বাকে মানতেই হবে। এর কোন বিকল্প পথ নাই।

তবু গাম্বা রাজি হল না। নির্মাকে নিয়ে গোপনে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী জানি কী ভেবে রাজি হয়ে গেল।

রাজি হল নির্মাও। তীব্র অভিমানকে মনের ভেতর লুকিয়ে রেখে নিজেই গাম্বার জন্যে পাত্রী পছন্দ করার দায়িত্ব তুলে নিল। পছন্দও করল মোনাকে। মোনা আর ও একই মায়ের পেটের বোন কিন্তু ওদের বাপ আলাদা।

সেই মুহূর্তে সাঁইপুত সমাজে পাত্রী হিসাবেও মোনার চাহিদা তখন তুঙ্গে। যে কোন পুরুষের আকাংখার নারী। তেংনাদা গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী কন্যা। মাত্র চোদ্দ বছর বয়েসেই যেন এক পূর্ণ যুবতী। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। ফরসা রঙ – চোখে পড়ার মতো গোলাপি গাল। নাকে মুখে মোংগোলিয়ান ছাপ থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা টানা টানা ভাব। চোখ দুটো স্বাভাবিক ভাবেই একটু ছোট, তবে একেবারেই যেন আকাশের মতো নীল। নরম কমলা কোয়া ঠোঁট। হাসলেই যেন মুক্তর দানা ছড়িয়ে পড়ে। দাঁতের সারির ফাঁক দিয়ে গজদন্ত উঁকি মারে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় ব্যাপার এখনও সম্পূর্ণ অনাঘ্রাতা – এই বয়সেও এখনও একবারও বিয়ে হয়নি!

এরপরে যেটা ঘটবার সেটাই ঘটল। বিয়ের পর প্রথম ক'দিন একটু অস্বস্তির মধ্যে থাকলেও গাম্বা খুব তাড়াতাড়িই নতুন বৌকে নিয়ে মেতে উঠল। স্বাভাবিকভাবেই নির্মার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে নতুন এক ক্ষমতার ভর কেন্দ্র গড়ে উঠল। মাঝে মাঝেই দুই বোনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিতে লাগল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা যেন প্রতিনিয়তে এসে দাঁড়াল। দুই বোনের একে অপরকে সহ্য করা তো দূরের কথা তাদের মধ্যে যেন মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবার উপক্রম হল। আর আশ্চর্যজনকভাবে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে প্রথম প্রথম নিরপেক্ষ থাকলেও গাম্বা যেন ক্রমশ মোনার দিকে হেলে পড়া শুরু করল। একদিন তা চরমে উঠল, সারাদিন পরে বাড়ি এসে গাম্বা মোনার অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে নির্মার গায়ে হাত তুলল!

স্বামীদের হাতে মার খাওয়া সাঁইপুত রমনীদের কাছে এমন কিছু নতুন ঘটনা না হলেও নির্মা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। তীব্র অভিমানে নিজেকেই যেন বলে উঠল, ব্যস, আর নয়। এবার এ ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও নোঙর বাঁধাই ভাল। কিন্তু তারই ক'দিন পরে সব মান অভিমান বিসর্জন দিয়ে অসুস্থ মোনাকে সেবা করতে গিয়ে ওর গর্ভবতী হয়ে পড়ার খবরটা আবিষ্কার করল!

চার

এরপরে প্রায় মাস চারেক কেটে গেছে। মোনার শরীরে গর্ভধারণের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে তা যেন ক্রমশ ভারি হয়ে পড়েছে। হাঁটা চলাও অনেক আস্তে ধীরে হয়ে গেছে। চেহারাতে কিছুটা ক্লান্তির ছাপ এসেছে। তা সত্ত্বেও এক অদ্ভুত জৌলুসে রূপ যেন একেবারে ফেটে পড়ছে! ছোলগেও নাকি গণনা করে দেখেছে, গাম্বার ঘরে এবারে পুরুষ সন্তান আসছে!

এত কিছু ঘটেছে, কিন্তু মোনার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। নিত্য নতুন কারণ বার করেও যেন নির্মার সঙ্গে ঝগড়া করাটাকে স্বভাবে পরিণত করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য ঝগড়াটা কিছুদিন ধরেই একমুখি হয়ে পড়েছে। হাজার অপদস্ত হলেও নির্মা যেন প্রত্যুত্তর করতেই ভুলে গেছে!

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ঘন মেঘের আড়ালে দিন ছোট হয়ে গিয়ে এরই মধ্যে সন্ধ্যে নেমে এসেছে। গত দু'দিন ধরে গাম্বা বাড়িতে নাই – শহরে গিয়েছে। কাল ফেরার

কথা থাকলেও ফেরেনি। আজও এখনও ফিরল না। নির্মা তাই খুব উদ্বিগ্ন মুখে সামনের দাওয়ায় বসে আছে। বাড়ির ভেতরে একটা লম্ফ জ্বলছে। তারই কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট আলোতে ওদের শোবার ঘরটা চোখে পড়ছে। ঘরটা এখন অবশ্য আর নির্মার নাই – মোনা ওটা দখল করে নিয়েছে। এই মুহূর্তে ও ওখানে শুয়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখে ওকে যেন ডিম ভর্তি কই মাছের মতো লাগছে।

শুধু ঘর কেন, মোনা ওর সর্বস্ব দখল করে নিয়েছে। অথচ কী ছিল এই বাড়ি। কী ছিল জেল থেকে ফিরে আসার পর গাম্বার অবস্থা। বাবা নাই, মা নাই, চাল নাই, চুলো নাই। পরণের কাপড় – কিংবা ফুটিয়ে খাবার মতো দু'মুঠো চালও নাই। থাকার মধ্যে আছে শুধু দুর্দান্ত বুনো চেহারাটা।

গাম্বার বাবা মারা গিয়েছিল ও জেলে থাকতে থাকতেই। জঙ্গলে সাপ ধরতে গিয়ে কামড় খেয়েছিল। ভয়ঙ্কর সে কামড় – প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুখে গেঁজলা তুলে ঐখানেই লুটিয়ে পড়েছিল। গাম্বার মাও ওর ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করেনি। শহরে বেতের ঝুড়ি বিক্রি করতে গিয়ে এক মহাজনের ঘরে গিয়ে উঠেছিল। এ বাড়ি তখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সারিয়ে যে তুলবে সে সাধ্যি গাম্বার ছিল না।

কেউ এগিয়ে আসেনি – এগিয়ে এসেছিল শুধু নির্মা। বেতের সামগ্রী বিক্রি করা নিজের জমানো টাকাতে কাঠ কিনে বাড়িটাকে প্রায় নতুন করে গড়ে তুলেছিল। শুধু তাই নয় – সস্তায় আরও বেতের জিনিস এনে দেবে এই শর্তে মহাজনদের কাছে পয়সা ধার করে গাম্বার সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে বাড়িতে রঙও করেছিল!

তেংনাদা গ্রামের সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। নবরু তো নির্মার সামনেই গাম্বাকে বলেছিল, 'তু বড়ো ভাগ্যবানী আছস। নির্মাকো পত্নী পাওনা ভাগ্য বাতো আছি।' হায়, আজ সেই বাড়িতেই নির্মা যেন এক ছেঁড়া কাগজোর মতো অপাংক্তেও!

অথচ ইচ্ছা করলে নির্মা তো এখনও নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারে। কতই বা ওর বয়স। বড়জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। চেহারাতেও এখনও সেই পুরানো ভাদরের জোয়ার। সেই দিনই তো সমরুত ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল নির্মা রাজি থাকলে এখনকার বৌদের সবাইকে ছেড়ে শুধু ওকে নিয়েই আলাদা ঘর বাঁধবে!

নাঃ, বৃষ্টিটা এবার আরও জোরে এল। গাম্বা নিশ্চয় আজ আর আসবে না। আসবেই বা কী করে – চারিদিক তো শুধুই অন্ধকার

আর অন্ধকার। সঙ্গে একটানা ব্যাঙেদের ডাক আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের আলো। আরও একবার বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তারই আলোতে সাদা মতো কী যেন একটা চোখে পড়ল!

কিন্তু ওটা কী – কী ওটা – একদমই সদর দরজার সামনে? হ্যাঁ, একটা সাপ বলেই তো মনে হচ্ছে! একদম সাদা রঙের – দুধ গোখরো। মহাদেবের গলায় থাকে – খুবই কম দেখা যায়। ভয়ঙ্কর বিষ! সাপটা বৃষ্টির জলে ভিজে একেবারেই যেন নাজেহাল হয়ে গেছে – তাই বোধহয় শুকনো জায়গা খুঁজছে।

নির্মা এখন তবে কী করবে? সাপটাকে তাড়িয়ে দেবে, নাকি গাম্বার জন্যে ধরে রাখবে? হ্যাঁ তাই ও করবে। সাপটাকে ধরে গাম্বাকে দেবে। গাম্বা সাপটার বিষ বার করবে। নির্মা সাপ ধরতে ওস্তাদ হলেও সাপের বিষ গালতে পারে না। গাম্বা শহরে গিয়ে সেই বিষ বিক্রি করবে – নিশ্চয় মোটা টাকা পাবে। চাই কী সাপটাকেও বিক্রি করে দিতে পারে।

গাম্বা নিশ্চয় খুব খুশি হয়ে উঠবে। ওর চোখদুটো আবার আগের মতো চক চক করে উঠবে। ও নিশ্চয় তখন নির্মাকে বুকে টেনে নেবে। ওঃ, কতদিন গাম্বা ওর দিকে ভাল করে তাকায়নি – ওকে বুকে টেনে নেয়নি!

নাঃ, গাম্বাকে ও ছাড়তে পারবে না – কিছুতেই না। গাম্বা যদি বাঘ হয় সমরুতরা তবে শিয়াল। বাঘ নিয়ে খেলা যার অভ্যাস সে শিয়াল নিয়ে কী করে খুশি হবে?

কিন্তু মোনা? মোনা যে ওদের দু'জনের মধ্যে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে – ? তবে – হ্যাঁ, এই পাঁচিল ওকে ভাঙতেই হবে – তা সে যেভাবেই হোক। তার জন্যে যা করার দরকার ও তাই করবে। হ্যাঁ, করবেই করবে!

ও আর এক মুহূর্ত দেরি করল না – একটা ছোট লাঠি নিয়ে লম্ফ হাতে দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে নিচে এল। তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সাপটার ফণাটাকে তালু বন্দি করে ফেলল!

ওঃ, সাপটার কী তেজ – মুঠোর মধ্যে থেকে কী তার গর্জন! মুহূর্তেই লেজ দিয়ে নির্মার হাতটাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু দক্ষ সাঁইপুত রমণীর কাছে সে চেষ্টা যেন নিতান্তই শিশুসুলভ!

নির্মা হঠাৎই এবারে সাপটার দিকে কেমন যে অদ্ভুত চোখে তাকাল। ওর চোখের দৃষ্টিটাও আচমকা যেন পালটে গিয়ে ভয়ঙ্কর

খরখরে হয়ে উঠল। ওর গলাটাও যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বুকটা যেন ধ্বক ধ্বক করে উঠল। মাথাটাও প্রবল যন্ত্রণাতে ছিঁড়ে যেতে লাগল। ওর সমস্ত সত্তাকে কে যেন দখল করে নিয়ে ওকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলল!

ও এবারে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলাতে চাইল। কিন্তু পারল না। বদলে এক ভয়ঙ্কর চোরা দৃষ্টিতে চারিদিক ভাল করে দেখে নিল। তারপর নিষ্ঠুর এক ডাইনির মতো খলখল শব্দে হেসে উঠল। শেষে এক হিংস্র শ্বাপদের মতো নিঃশব্দে দাওয়ায় উঠে মুঠোয় ধরা সাপটাকে ঘুমন্ত মোনার গায়ে ছুঁড়ে দিয়েই দরজাটা সামনে থেকে টেনে সজোরে বন্ধ করে দিল!

অলঙ্করণ : বিশ্বজিৎ আইচ

স্মৃতি বিজড়িত যুগের স্থাপত্য আমরা

কামরুজ্জামান

২০২০
বিশে বিশ না বিষে বিষ?
একটি বছর। মাত্র ৩৬৫ দিন? না ৩৬৬ দিন
লিপইয়ার বর্ষ?

মৃতের সংখ্যা আমি শুনতে পাইনি
সংখ্যা ভুলে আমরা একটি মানুষ মাত্র
আর যারা মারা যাচ্ছে?
তাদের দেহগুলোর কী হলো জানি না
দেশ ডুবছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে
সূর্য অস্ত যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের কোলে পর্বতের মাথায়
আকাশে কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ আমাদের সভ্যতা
মানুষের জীবন (পেট!) ক্ষুধায় ধিক্ ধিক্ জ্বলছে
অশ্রু জমে বরফ—সব দেখছে মরা চোখ।

সব দেশ-ই নক্ষত্র নির্জন। বুনো মোষ পালকের রাত
মাথায় খোলা আকাশ ছাতার মতো ক্রমশ ছোট হচ্ছে
ছোট হ'য়ে আসছে মেঘের ভূগোল কিংবা তার মানচিত্র
স্বপ্নে বেঁচে থাকতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়েছে নিরক্ষরেখায়
যেখানে মানুষ শূন্যডিগ্রি কিংবা তার স্বপ্ন
শেষ করে বধ্যভূমিতে চাঁদ ডুবছে তার নিজস্ব ভূগোল মেনে

মনে হচ্ছে ক্লান্ত এক ধূসর দ্বীপপুঞ্জে
স্মৃতি বিজড়িত যুগের স্থাপত্য আমরা
ধারাবাহিক কঠিন রাতের একাকীত্বে মারা যাচ্ছে
চোখের জমাট অশ্রু কিংবা তার মিথ্যা স্বপ্ন

চোখের অস্থির জলে ছায়া পড়ছে কেঁপে কেঁপে
তুলোর শূন্যতা (ওজন!) নিয়ে মাথায় নামছে মেঘ
গর্ব করার মতো মেঘবৃষ্টি আজ মনুষ্যজাতির কান্না
ধীরে ধীরে ছায়া ডুবে যাচ্ছে ঘন অন্ধকারের জলে

আদমসুমারিতে আমরা একটি সংখ্যামাত্র
প্রিয়জনদের কাছে গোটা পৃথিবী

আগামী হাজার বছরে পরে—মনে পড়বে তো...!
কেন ঈশ্বরের কাছে এতো আবেদনপত্র জমা দেওয়া!
মানুষ তো দুঃখ পাওয়া একটি মানবিক মুখ

জোড়া চোখ শূন্যতা নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম
মনে মনে ভাবলাম, পৃথিবীতে যেদিন একটিও মানুষ থাকবে না
কে নেবে আলোর প্রখরতা, অন্ধকারের গভীরতা!
আকাশের স্নিগ্ধতা আর বাতাসের স্পর্শতা!
গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু নিজে নিজে খসে পড়বে
বলা যায় আত্মহত্যা করবে
কেউ থাকবে না তাদের দেখার কিংবা বাঁচানোর
কাল্পনিক পৃথিবী হবে জনমানব শূন্য ইতিহাস

তখন অহংকারী পৃথিবী আবার জীবনের কথা ভাববে
স্মরণ করবে প্রথম মানুষ-মানুষী আদম-ইভের কথা
বাঁচার তাগিদে সৃষ্টির (ইতিহাসের!) পুনরাবৃত্তি

পৃথিবী ডুবে গেছে আধুনিক নদী (দূষণ) সভ্যতায়
ডুবছে নৌকা। মরছে মাঝি। তীরে দাঁড়িয়ে শূন্য কলোনি
চরে ভেসে উঠেছে মানুষ শূন্য জোয়ার-ভাটা যুগ
শূন্য মাঠের মতো ফাঁকা পড়ে রয়েছে পৃথিবী
দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে সিকিভাগ স্থলের ব্যবহৃত জল
কালো (পোয়াতি!) নেই—বৃষ্টির সম্ভাবনা শূন্য
গাছের মাথার ওপর যে ঢেউগুলো দেখছি
তা বর্ষাকালের একটি মেঘের স্মৃতি মাত্র

ব্যক্তিগত বলে আর কিছু নেই মানুষের
মানুষ তো দু:খ পাওয়া একটি মানবিক মুখ

দরকার ছিল না ঈশ্বরের কাছে এতো অবেদনপত্র জমা দেবার
দু'দুটো যুদ্ধ হয়ে গেছে
তৃতীয় যুদ্ধটিতে মানুষের কোনো ছায়া নেই
শুধু ভারত নয়—গোটা বিশ্ব আক্রান্ত
পৃথিবীর একটি নতুন সংস্করণ করোনা

অসুখ সেরে যাবে—আগামী কোনো একটি ভোরে...
পৃথিবীর সব মানুষেরা একটি হৃদয়ে বয়ে
আবার গড়ে উঠবে নতুন জনপদ কিংবা কলোনি

এখন বন্ধুত্ব আমাদের যুদ্ধ
মানুষ দেখলে ভয় পাচ্ছে মানুষ
বদলে যাচ্ছে বন্ধুত্বের জ্যামিতি
আদিম শব্দটির পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী
আর মানুষ কত অসহায়

মানুষের একাকীত্ব মেঘের ফসিল
আকাশ কখনো দাউ দাউ করে জ্বলছে
বিছানা কিংবা রান্নাঘর থেকে গর্ভবতী নারীরা দেখছে
গর্ভের মধ্যে শিশুরা কিভাবে বড়ো হচ্ছে

পৃথিবী একটি কমলালেবুর মতো খসে পড়ছে
আলোকবর্ষ দূরে সন্ধ্যা নামছে অন্য এক দ্রাঘিমা রেখায়
যেখানে পৃথিবী অনুপস্থিত
আর শিকল ছিঁড়ে পালাচ্ছে পোষা আকাশ
অন্ধকার শূন্যতা বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরেছে

আমরা কাঁদছিলাম বিশাল মেঘের নিচে
মেঘের জল তো জল নয়, যেন লবণাক্ত হ্রদ
কে জানতো বিশাল আকাশের নিচে আমাদের এখানে হত্যা করা হবে!

আকাশ মধ্যযুগের মাঠ, সংরক্ষিত চাঁদ। হিমশীতল রাত্রি
আমরা পান করছি পূর্ণিমা আলো। অমাবস্যা অন্ধকার
এক-একটি মানুষ একাকীত্ব নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে
গভীর জলের মতো রাত্রি বাড়ছে
দাউ-দাউ করে জ্বলছে অন্ধকার ফাঁপা শস্যদানা হয়ে যাবে না বলে
একটি প্রচণ্ড সূর্যকে তৈরি করে নিচ্ছি নিজের মতো
কাঁচা আমলকির মতো রোজ রঙে বাঁচতে চাইছি

ফুলের মতো হেসে ফুটে রয়েছে আলো
শরীরে কান পেতে শুনছিলাম রক্তস্রোত
জানি না কিভাবে সংক্রমিত হলো পৃথিবী
আমাদের মাইলস্টোনগুলো ছোট পরিবারের মতো আক্রান্ত
মৃত্যুর হাত থেকে খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমি একজন
জানি না, মৃত্যুর পরে কিভাবে আবার শরীরে ফিরে আসা যায়!
পৃথিবীর সব মানুষের একটি হৃদয়ে বয়ে
কাফনে বন্দি জীবন বাঁচুক অন্ধকার আলোকসভায়

আমাদের প্রত্যাশা একটি বিশুদ্ধ ভোরবেলা
আমাদের বিশ্বাস পৃথিবী একদিন শান্ত হবে
পুনরায় গড়ে উঠবে নতুন জনপদ আর পুরোনো কলোনি...
আমাদের জল নেই—আছে রক্ত
জারিত শ্মশান-গোরস্তানের নীরবতা সবদিক

রাতের আকাশ আধুনিক যুগের অজন্তা-ইলোরা
সম্পূর্ণ নগ্ন আর বোবা
গ্রহ-নক্ষত্রদের নিয়ে আকাশ ফিরে যাচ্ছে পূর্ণিমা আর অমাবস্যায়
মুখে অসুখের মতো শুকনো হাসি নিয়ে

সকাল নামছে খড়ের চালে। টালির ছাদে। টেরিশে। কার্নিশে
পথ-ঘাট শুনশান। নেই কোথাও কোলাহল
সূর্য ফিরে যাচ্ছে—সন্ধে নামছে শহরে আর গ্রামের শেষে
জীবিত শ্মশান-গোরস্তানের নীরবতা সবদিক
কোটি কোটি পেটের খিদে আর বুকের জ্বালার তীব্র হাহাকার

রাতের নিচে রাত। একটি সাজানো পৃথিবী সকলের মৃত্যুর মতো
মনের জমাট দু:খ। চোখের ভেতরে শুকনো অশ্রু হয়ে মারা যাচ্ছে

সূর্য, সম্রাটের সুখানুভূতি নিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বাঘের মতো রোদ
প্রজারা ভয়ে গৃহবন্দী। তাদের হৃদয় শূন্য (খালি!)
সূর্য একটি ধর্মগ্রন্থের মতো দাউ-দাউ করে পুড়ছে একা
যেমন করে তৈরি হয় অসহায়ত্ব কিংবা তার দীর্ঘশ্বাস
মানুষ তো সুখ-দু:খ আর আনন্দ-বেদনার যোগফল
আমরা মানবজাতি, পৃথিবীর চেয়ে শক্তিশালী
আমাদের জল নেই—আছে রক্ত
জয়ের উল্লাসে আমরা কী পৃথিবীকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি
কিংবা মৃত্যুর চেয়েও আরো কিছু থেকে থাকে সেই দিকে?

বি: দ্র:—একদিন হয়তো আবার এইসব ঠিক হয়ে যাবে...

একটি চিঠি

২

বাড়ির মধ্যে যদি বন্দি আমার দু'চোখ মাপের ছোট্ট পৃথিবী

আত্মগোপনে চলে গেছে শহর। আশ্রয়হীনতায় ভুগছে গ্রাম
রাতের আকাশ মধ্যযুগের গুহচিত্রের মতো নগ্ন আর বোবা
গ্রহ-নক্ষত্ররা ফিরছে পোতাশ্রয়ে আর পৃথিবী ফিরে যাচ্ছে বন্দরে
প্রতিদিন ভোর ভেবে সূর্য ফিরে যাচ্ছে মনখারাপ নিয়ে

শূন্য পথ-ঘাট। শুনশান জনবসতি। নিস্তব্ধ কোলাহল
ফাঁকা জেব্রা কিংবা লেভেল ক্রসিং। সংকেতহীন সিগন্যাল
একলা দাঁড়িয়ে পুরীর মন্দির। দিল্লির নিজামউদ্দিন আওলিয়া দর্গা
দর্শনার্থী শূন্য আগ্রার তাজমহল। পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দির

মৃত্যু ভয় শেষ ভয়। জীবন বড় প্রিয়
আমাদের অহঙ্কার থরথর করে কাঁপছে মৃত্যু ভয়ে

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি অপরিচিত অসম যুদ্ধ
যুদ্ধ কী কেবল অদৃশ্য করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে!
কিংবা লকডাউনের খাবারের অভাবে গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন
এও নয় কী এক-একটি পরাজিত মানুষের যুদ্ধের ধারাবিবরণী?

অভিবাসী শ্রমিকদের ট্রেনের তলায় প্রাণ নিবেদন
গুচ্ছ গুচ্ছ অন্ধকারেও ধিক ধিক করে জ্বলছে একাকী জোনাকী
দূষণ মাত্রাতিরিক্তভাবে কমেছে। বেড়েছে আকাশের দৃশ্যমানতা
সমুদ্রে দেখা মিলেছে ডলফিনের। পরিযায়ী পাখিরা আবার আসছে
প্রকৃতি আবার স্বস্তির শ্বাস নিতে পারছে
আত্মঘাতী জঙ্গিরা প্রাণভয়ে ডেরায়। বন্দুক ছেড়ে জোড়হাত...
কাশ্মীর আজ শান্ত—সেনাবাহিনীর আর দরকার নেই
নারীরা অনেক বেশি সুরক্ষিত। ধর্ষণ শূন্য ভারতবর্ষ
সারা বছর কাছে ব্যস্তরা ধুলোপড়া পছন্দের বইটা পড়ছে একমনে
কোথাও হিংসা, বিদ্বেষ নেই—ঘৃণার বদলে দখল নিয়েছে ভালোবাসা

৩

মেঘের খামে আকাশের ঠিকানায় চিঠি দিলাম
উত্তর দিও খুশির অশ্রু বৃষ্টিতে

পুনশ্চ : করোনা'র তাণ্ডব একদিন থেমে যাবে
শান্ত হবে পৃথিবী—এক নতুন সকাল নিয়ে
কোভিদ-১৯ পরবর্তী পৃথিবী হবে এক নতুন পৃথিবী...

প্রবন্ধ

শ্রমিকের ঘরে হাহাকার

রাহুল মজুমদার

মাথার ওপর এক আকাশ চড়া রোদ ঢালতে থাকা সূর্য নিয়ে ওঁরা দীর্ঘ পথ হেঁটেছিল। হেঁটেছিল মাথার ওপর এক আকাশ নক্ষত্র আর আঁধার নিয়ে। এঁদের প্রায় সকলের হাতেই ছিল না টাকা, খাবার এমনকি জলটুকুও। ছিল ঘরে ফেরার তাগাদা আর বাঁচার আশা। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্র শিরোনাম করেছিল 'ইণ্ডিয়া ইজ ওয়াকিং হোম'। ঠিক যেন ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময়কার ভারত-চিত্র।

শেষ হয়নি ঘরে ফেরা। সওয়া দু'মাসের লক-ডাউন মেয়াদ শেষ হলেও কর্মচ্যুত হয়ে ঘরে ফেরার পথ ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। পাঁচ বছরের ছেলের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতেই এক নির্মাণ শ্রমিক জানালেন, আমাদের একটা নিজস্ব ঘর রয়েছে কিন্তু কেনার মতো সামর্থ্য নেই। দেশের রাজধানী দিল্লি থেকে রওনা দেওয়া এই পরিবারটির লক্ষ্য ৭০০ কিলোমিটার দূরে মধ্যপ্রদেশের এক অখ্যাত গ্রামের ঘরে পৌঁছনো। এমন আরও বহু পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গেই

ঘরে ফেরার পথে ছিল সেই মানুষগুলো যাঁরা ঘর পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেনি। ২৪ মার্চ মধ্যরাতে লাগু হওয়া দেশজোড়া লক-ডাউনের ঘোষণায় রাতারাতি সমস্ত কর্মক্ষেত্রগুলো জনমানবশূন্য হয়ে পড়লো। খোঁজ মিললো না ঠিকাদার, নিয়োগকর্তা কারওরই। আর কর্মচ্যুত হওয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নেমে এলো রাস্তায়। কোভিট ১৯ ভাইরাস সংক্রমণের পথ ধরে অভাবী অনাহার ক্লিষ্ট ভারতের শরীর বেড়ে উঠছে।

এমন কঠিন সময়েই রাজস্থানের কোটা জেলার কুনহাডি থানা এলাকায় আটার প্যাকেট বোঝাই একটা ট্রাক লুট হওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিওতেই দেখা যাচ্ছে ট্রাকের মালিক জীতেন্দ্র ভাটিয়া জানাচ্ছেন যে মানুষগুলো আটার প্যাকেট লুঠ করছে তাঁরা কোন অপরাধ করছে না। অভাবী মানুষের কাছে খাবার না পৌঁছলে এমন পথেই যাবে গ্রাম ভারত। অবশ্য কোটার পুলিশ সুপার গৌরব যাদব জানিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি এই লুঠ করতে নামা মানুষগুলোকে গ্রেপ্তার করা হবে। ঠিক যে সময় রাজস্থানের ট্রাক মালিক জানাচ্ছেন খাবার লুঠ করতে নামা মানুষগুলোর কোন অপরাধ নেই, তখনই এরাজ্যের এগিয়ে থাকা একটি সংবাদপত্র তার সম্পাদকীয় লেখনীতে তুলে ধরে সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ হওয়া মৌলিক অধিকারে থাবা বসানো।

ঘুম চোখেও বড় স্পষ্ট খোদাই ছিল ঘরের ঠিকানা। ঔরঙ্গাবাদের খোলা রেললাইনে জড়ানো ১৬ শ্রমিকের মাংসপিণ্ডে শুধু নয়, গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা বহু রাজ্যের অসংখ্য রাজপথে পা মেলানো লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর জেগে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা চোখে স্পষ্ট খোদাই ঘরের ঠিকানা। মাইলের পর মাইল অনন্ত হেঁটে চলা শ্রমিক যাঁদের সংখ্যা ৩১শে মার্চে ছিল ৬ লক্ষ ৬০ হাজার সেই সংখ্যাই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পেরিয়ে যায় ১৪ লক্ষ। তারপর বেহিসেবী পরিসংখ্যান ঘণ্টায় ঘণ্টায় লক্ষের ধাপ পেরিয়ে কোটি ছাড়িয়ে নির্বাক হয়েছে সরকার, প্রশাসন।

ভুখা পেটে রোটি মিলেছিল, তাই শ্রম নিংড়ানো শরীর জুড়ে নেমে এসেছিল অগাধ ক্লান্তি। আর তাতেই রেললাইনের মাঝে কংক্রিটের স্লিপার হয়ে উঠেছিল নরম গদি, লোহার পাতা লাইন হয়েছিল মাথার বালিশ। আদালতে বাগ্মী আইনজীবীদের সওয়াল রেললাইন কিভাবে ঘুমনোর জায়গা হতে পারে? কার্যত দুর্ঘটনায় দায় এড়িয়ে আত্মহত্যার অপরাধে চালান করে দিয়ে মৃত শ্রমিকদের

কাঠগড়ায় তোলা হলো।

মধ্যপ্রদেশের শাহদোল জেলার শ্রমিক ইন্দরলাল ধুরে, সজ্জন সিং চির-নিদ্রার লাইন থেকে একচুল দূরত্বে ঘুমিয়ে ছিল। ওঁরাই জানাচ্ছেন, মহারাষ্ট্রের জালনার এসআরজি এবং পোলাড কোম্পানিতে কর্মরত এই ২০ শ্রমিক লক-ডাউন লাগু হওয়ার পর থেকে কার্যত অভুক্ত অবস্থায় কারখানায় বন্দী জীবনে। এনজিও-দের দেওয়া খাবারের ওপর ভরসা করেই থাকা। দু-তিনদিন অন্তর খাবার মিলতো। এমন অনিশ্চয়তার জীবন থেকে মুক্তি নিতেই ওঁরা বেরিয়ে পড়েছিল ঘরের পথে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে জালনা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরত্বে কারমাডের কাছে লাইনের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ওঁরা। রেললাইনের ধারে পড়ে থাকা রুটিতে রক্তের ছোপ। লাইনের ওপর দিয়ে চলা লোহার পরিযায়ী চাকার সঙ্গেই লেপ্টে রইলো ওঁদের শরীর।

দুর্ঘটনা নয়, একটা পরিকল্পিত গণহত্যা। কোন অভিযানে রওনা দেওয়ার আগে পদাতিক সেনা বাহিনীকেও চার ঘন্টার বেশি সময় দেওয়া হয় প্রস্তুতিতে। কিন্তু লক-ডাউন ঘোষণায় ঘর, রুজি, সংসার গোছানোর কোন সময় দেননি দেশের প্রধানমন্ত্রী। পেটের খিদের দায় নেয়নি দেশের সরকার। লক-ডাউনে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের মজুরি এমনকি বকেয়া মজুরিরও দায় নেয়নি কারখানার মালিক, নিয়োগকর্তা ঠিকাদার কেউই। অতএব অনিশ্চয়তার যাত্রাপথ নয়, নিশ্চিত মৃত্যুর পথে দেশের লক্ষ লক্ষ, কোটি পরিযায়ী অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

একটা সদ্য নেমে আসা আঘাতে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠার পর নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার সময় বা সুযোগ কোনটাই ছিল না মহম্মদ ইদ্রিশের। তাই ১৩০ কোটি ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে টিভিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের মর্মার্থ কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না ইদ্রিশের। লক ডাউনের ঘোষণায় প্রতিটি ভারতবাসীর প্রতি মোদীর নির্দেশ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে এখন প্রতিটি নাগরিককে ঘরে থাকতে হবে। কিন্তু ওর মাথায় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কি জানা নেই যে আমাদের কোন ঘর নেই! খুব সম্প্রতি দেশের রাজধানী দিল্লির বুকে মুসলমান বিরোধী দাঙ্গায় তাঁর ঘর থেকে টিভি-সহ যাবতীয় আসবাবপত্রই লুট হয়ে গিয়েছিল। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি শহরের উত্তর পূর্ব থেকে আসা দাঙ্গাবাহিনী দিল্লির শিব বিহারে মুসলমানদের ওপর চারদিন ধরে যে নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছিল

তাতে ৫৩ জন মুসলিমের জীবনহানি হয় এবং হাজারেরও বেশি মানুষ গুরুতর জখম হন। সেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যেই মহম্মদ ইদ্রিশের আশ্রয় জুটেছিল দিল্লির ইদগা রিলিফ ক্যাম্পে। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হুঁশিয়ারির মুখে পড়ে এরপর ইদ্রিশকেও সেই একমাত্র আশ্রয়স্থল ক্যাম্প ছাড়ার নির্দেশ দেয় দিল্লি প্রশাসন। টিভিতে মোদীর ভাষণ শুনে ওয়েল্ডার আবদুল সাত্তারের সোজাসাপটা প্রশ্ন কাকে ঘর বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? দিল্লির দাঙ্গায় যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল ওর পরিবারকে সেই সময় একটা জামাকাপড়ও আগুনে গ্রাস থেকে বাঁচেনি। সারাটা রাত ফুটপাতে কম্বলের তলায় আশ্রয় নেওয়া সপরিবার আবদুল সাত্তারের এখন লক্ষ্য খজুরি খাসের কাছে তাঁর পুরনো গ্রামে ফিরে যাওয়া। কিন্তু সেখানেও নতুন করে আতঙ্ক রয়েছে প্রতিবেশী রোষের কোপে পড়ে যাওয়ার। দিল্লির চান্দুনগর আপাতত দাঙ্গা-বিধ্বস্ত সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে নিয়ে একটা নতুন রিফিউজি কলোনি। হামলার ফলে ঘরবাড়ি ছেড়ে মুমতাজ তৌফির এখানেই একটা দশফুট বাই দশফুটের ঘর পেয়েছে। যেখানে ঠাঁই নিতে হয়েছে তাঁর বাবা-মা, চার ভাই ও তাঁদের স্ত্রীকে।

দিনমজুরের কাজ করতেন মঞ্জু যাদব। লক ডাউনে রোজগার বন্ধ। পাঁচটি বাচ্চার মুখে খাবার তুলে দিতে না পারার হতাশায় তাদের গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তিনি। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে উত্তর প্রদেশের ভাদোহির জাহাঙ্গিরাবাদ গ্রামে। ১১ বছরের রাহুল মুসাহরের কথা আমরা আগেই জেনেছি। বিহারের ভোজপুরের এই কিশোর লক ডাউনে অনাহারে মারা গেছে। সে তার বাবার সঙ্গে ছাঁট সংগ্রহের কাজ করত। প্রধানমন্ত্রীর লক ডাউন ঘোষণার সপ্তাহ পেরনোর আগেই দেশের রাজধানী থেকে ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া জনা কুড়ি পরিযায়ী শ্রমিক শুধু অভুক্ত পরিশ্রমী শরীর নিয়ে নিষ্প্রাণ ঢলে পড়েছিল রাজপথেই। ঘরে ফেরার তাগাদায় এই হাজারো পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপরেই পুলিশের নির্মম লাঠি রক্ত ঝরিয়েছে পর্যন্ত।

দিনমজুর, অস্থায়ী, অনিশ্চয়তায় ভরাজীবনের এই কারিগরেরা পুলিশের নির্মম আঘাতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় যখন সংবাদমাধ্যম সোচ্চার হয় তার পরিণতি কী?

লক্ষ্য রাজনৈতিক জরুরি অবস্থা জারি। সেই লক্ষ্যেই একটা মোক্ষম অজুহাত মেডিক্যাল এমার্জেন্সি। সম্প্রতি দিল্লি উত্তর প্রদেশ

সীমান্তে ঘরে ফেরার পথে রওনা দেওয়া হাজারো পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর পুলিশের নির্বিচার লাঠি চালানোর প্রতিবাদে ‘ওয়ার’ পত্রিকা সোচ্চার হওয়ায় তেমনই পদক্ষেপ নেমে এলো একটা সরকারের পুলিশ, প্রশাসনের তরফে। হোয়াটস-অ্যাপ, ই-মেইলের জমানায় একটা ওয়েব জার্নালের সম্পাদককে জরুরি তলব করতে ৭০০ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি? সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের পুলিশ একটা নম্বর প্লেটহীন কালো এসইউভি গাড়িতে ৭/৮ জন পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে ৭০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে দিল্লিতে ম্যাগাজিনের সম্পাদক সিদ্ধার্থ বরদারাজনের বাড়িতে পৌঁছেছিল। যে সময় লক ডাউনের ঘোষণায় ট্রেন, বিমান এমনকি বেসরকারি সড়ক পরিবহন নিষিদ্ধ, যে সময়ে সমস্ত রাজ্যেই সংক্রমণের মোকাবিলায় নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় একটা সরকারের পাশে দাঁড়ানো অবশ্য কর্তব্য ঠিক সেই সময়েই ‘ওয়্যার’ পত্রিকার সম্পাদক বরদারাজনের বাড়িতে এমন পুলিশী অভিযান। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের এমন স্বাধীন মতপ্রকাশের ওপর পুলিশী জুলুমে মাথা নত করেননি শিক্ষিত বিদ্বৎজনেরা। আইনজীবী, লেখক, শিল্পী বুদ্ধিজীবীসহ প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ স্পষ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছেন এমন পুলিশী পদক্ষেপের। লক ডাউনের পরিস্থিতিতে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিরই যাবতীয় সভা, সমাবেশ, কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা চেপেছে। প্রতিটি নাগরিকের ওপরেই ঘরবন্দী জীবন চেপে বসেছে, কিন্তু লক ডাউনে উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার একটি সংবাদমাধ্যমের ওপর রোষ আছড়ে ফেলার কাজে ছেদ পড়েনি।

পেটে খিদের জ্বালা নিয়ে দীর্ঘপথ হাঁটা যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর উত্তর প্রদেশ সরকারের পুলিশের লাঠি চরম নির্মমতায় পড়েছিল তাঁদের মধ্যে কি উত্তর প্রদেশের শ্রমিক ছিল না? ২৬ বছর বয়সী অটো মোবাইল শ্রমিক রজনীশ দিল্লি থেকে পথ হাঁটা শুরু করেছিল। লক্ষ্য আড়াইশো কিলোমিটার দূরত্বে উত্তর প্রদেশের একটি অখ্যাত গ্রামে পরিবারের কাছে পৌঁছনো। দীর্ঘ যন্ত্রণার পথে পা চালাতে চালাতে বলেছিল করোনা ভাইরাস শরীরে সংক্রামিত হওয়ার আগে হয়তো রাস্তাতেই মৃত্যু হবে। ঠিক যেমন হয়েছিল ৩০০ কিলোমিটার দূরত্বে মধ্যপ্রদেশে ঘরে পৌঁছনোর আগেই ৩৯ বছর বয়সী এক পরিযায়ী শ্রমিকের বুকে ব্যাথা দিয়ে শুরু, কিছু পরে মৃত্যু। ৬২ বছর বয়সী আরও এক শ্রমিক ঘরের কাছে পৌঁছনোর

আগেই নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে রাস্তাতেই ঢলে পড়েন। তাঁর দেহ সঙ্গের আরও চার পরিযায়ী শ্রমিক একটি ট্রাকের ওপর তুলে অন্ধকার হাইওয়ের পথে রওনা দেয়। একশো কিলোমিটার দূরত্বে রাজস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া কাজরীর সঙ্গী ছিল এক প্যাকেট বিস্কুট আর বিড়ির প্যাকেট। পথেই সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল পেটের খিদে কমাতে বিড়ি খুবই সাহায্য করে।

'অতিথি-শ্রমিক' শব্দবন্ধের প্রাদুর্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে। যুদ্ধশেষে জার্মানিতে তুরস্ক থেকে কাজ করতে আসা আমন্ত্রিত শ্রমিকরা এই নামেই অভিহিত হতেন। একটা জাতি গঠনের লক্ষ্যে এই অতিথি শ্রমিকদের কাজে লাগানো। এরপর সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বিশ্ব থেকে পশ্চিমের দিকে পা বাড়ানো উচ্চ-মধ্যবিত্ত হোয়াইট কালার ওয়ার্কারদের সংখ্যা বিপুল হারে বেড়েছে। করোনা সংক্রমণের আতঙ্ক যে সময় দুনিয়ার প্রায় সব দেশকেই গ্রাস করেছে সেই সময়েই নিজের ঘরবাড়ি, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অংশের অতিথি শ্রমিকদের সমাদরে দেশে ফিরিয়ে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যাঁরা দেশে ফেরার পর পার্টি দিয়েছে, জনসমাগমের মোচ্ছবে শামিল হয়েছে। বিপজ্জনক কোভিট ১৯ ভাইরাস সংক্রমণে যে সময় বিশ্ব উথাল-পাথাল তখন এই দেশে ফেরানো অতিথি শ্রমিকদের জন্য কী ব্যবস্থা ছিল? ভাইরাস সংক্রামিত কিনা তা দেখার জন্য পরীক্ষা হয়েছে? আইসোলেশন বা কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছিল কি তাঁদের? না, বরং ১৩০ কোটি ভারতীয়ের শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে দেওয়ার সু-বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু এই একই সময়ে কর্মহীনতা গ্রাস করে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য রাজ্যে পেটের তাগিদে ছুটে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা ঘরে ফিরতে পা বাড়িয়েছে রাজপথে। যাঁদের জন্য পেটের খিদে মেটানোর খাবার ছিল না, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুলিশের নির্দয় লাঠি ছিল। যে কোন শহরের সবচাইতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ খুঁজে সেখানেই তাঁদের আটকে রাখার কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা লাগু হয়েছে। অথচ এই পরিযায়ী শ্রমিকরাই দেশের যাবতীয় নগরের উন্নয়ন, সেতু, উড়ালপুর, সুউচ্চ মিনার তৈরির কারিগর। দুঃখের হলেও সত্যি করোনা সংক্রমণ দূর করতে যিনি একটা নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে হাততালি দেওয়া, থালা বাজানোর কর্মসূচি দিয়ে রাখলেন ভারতবাসীকে তিনিই 'স্বদেশ' আর 'পরদেশ'-এর বুলি আওড়ান। বিদেশ থেকে বিত্তবানের বয়ে আনা ভয়ঙ্কর রোগ

যখন সংক্রামিত হয়েছে দেশের গরিব, মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে, তখন নিরন্ন, কর্মহীন দারিদ্র্যের জ্বালায় জলতে থাকা মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে প্রশাসন, সমাজের একটাই হাঁক – 'দূর হঠো'।

করোনা ভাইরাসের হাত থেকে পরিত্রাণ মিললেও ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা নেই। এমন সতর্কতা মিলেছে খোদ রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম সম্প্রতি জানিয়েছে শুধুমাত্র ক্ষুধা আর অনাহারে চলতি বছরের শেষে গোটা দুনিয়ায় মৃত্যু হতে চলেছে ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের। ঠিক গত অর্থবর্ষে যে সংখ্যাটা ছিল বিশ্বে ১৩ কোটি, সেটাই দ্বিগুণ আকার নিতে চলেছে এবার। রাষ্ট্রসঙ্ঘ জানিয়েছে, ক্ষুধা, দারিদ্র্য অভাবে জর্জরিত দেশগুলিতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক পদক্ষেপ না নিলে এই পরিণতিই অপেক্ষা করছে। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. আরিফ হোসেনের কথায়, এই মুহূর্তে কোভিট ১৯ সংক্রমণের জেরে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর আশঙ্কায় দিন গুনছেন। কিন্তু এই সংক্রমণের আওতার মধ্যে পড়া জনসংখ্যার কয়েকগুণ মানুষ ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত খাদ্য সঙ্কটের শিকার। যাঁরা প্রতিদিনের উপার্জনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকেন, সেই সমস্ত মানুষ এবার লক ডাউন এবং বিশ্ব আর্থিক মন্দার জেরে আরও নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনগুলি একযোগে জানিয়েছে করোনা সংক্রমণের জেরে বিশ্ব খাদ্য সংকট মহামারীর আকার নিতে চলেছে। বেশকিছু গরিব দেশের কাছে এই মুহূর্তে করোনা সংক্রমণে আক্রান্তদের বাঁচানোর শর্ত হিসেবে বহু মানুষকে ক্ষুধা, অনাহার এবং নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার রাস্তা খুলে গেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেজ সতর্ক করেছেন, শুধু ভাইরাসের মোকাবিলা করা নয়, তার সঙ্গে ক্ষুধা ও অপুষ্টির সঙ্গেও লড়াই চালাতে হবে আমাদের। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং রাষ্ট্রনেতা ও পরিচালকদের তরফে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে পেশ করা এই রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে ২০০৭-০৮-এর বিশ্ব খাদ্য সঙ্কট এবং খাদ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিত ফিরে আসতে চলেছে। মধ্য প্রাচ্য, এশিয়া থেকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে যে প্রভাব আজও জারি। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের প্রাথমিক পরিকল্পনা এই মুহূর্তে ৩৫ কোটি ডলার

প্রয়োজন এই খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে। করোনা সংক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কা বিশ্বের যে বিশাল ক্ষমতাধর দেশের অর্থনীতিতে লেগেছে তারমধ্যে রয়েছে চীন, ইতালি, স্পেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির তথ্য এখনও বিস্তৃত চেহারায় এসে পৌঁছয়নি। যেখানে সংক্রমণ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত টেস্ট এবং স্বাস্থ্যবিধি গ্রহণ করার সুযোগ কম। ইতিমধ্যেই এই দেশগুলিতে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের মধ্যে খাদ্য সঙ্কটের প্রভাব স্পষ্ট।

এই মুহূর্তে বিশ্বে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তুর পরিচিতিতে। এই পরিস্থিতিতে লক ডাউনের পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই চরম সংকট এনে দেবে বিশেষত কৃষিকাজে যুক্ত মানুষের ওপর, দিবমজুরদের ওপর, পণ্য বিক্রির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ওপর। এদিকে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যদি উন্নত পুঁজিবাদী ধনী দেশগুলি তাদের নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভার উন্নয়নশীল গরিব দেশগুলির কাঁধে চাপাতে চায় তাহলে বিপর্যয়ের মাত্রা আরও বাড়বে। পুঁজিবাদী দেশগুলির বেসামাল পদক্ষেপের ইঙ্গিত মিলেছে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফেই। এমন সংক্রমণ বিপর্যয়ের জেরে ইতিমধ্যেই আমেরিকা জি-২০ দেশগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের যৌথ ইশ্‌তেহারে সই দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। এমনকি বিশ্বাস্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউ এইচ ও-র জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বরাদ্দ অনুদান স্থগিত রেখেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প।

দেশের ৪৫ কোটিরও বেশি শ্রমশক্তির ৯৪ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে থাকেন। সংগঠিত সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত মাত্র ৬ শতাংশ শ্রমশক্তির রয়েছে মাস মাইনে, বেতন কাঠামো, সবেতন ছুটি, মেডিকেল ফেসিলিটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ইত্যাদি যা অবশ্যই ন্যায্য পাওনার তালিকায়। যাদের একটা অংশ লক ডাউনে ঘরে বন্দি থেকেই কম্পিউটার-ল্যাপটপে কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন। আর একটা অংশ এই কঠিন সময়ে নিজেকে বিপন্ন করেই জরুরি পরিষেবা চালু রাখতে (অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই) ঘরের বাইরে দেশ ও জনগণের সেবায় ব্রতী। কিন্তু যাঁদের অক্লান্ত মেহনত সভ্যতাকে সচল রাখে, এগিয়ে নিয়ে যায় – তাঁরাই আজ সবচাইতে বেশি বিপন্ন। কোভিট ১৯ ভাইরাস সংক্রমণের বিশ্ব বিপর্যয়ের সবেমাত্র শুরু। বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল নির্বিশেষে যাবতীয় দেশগুলির জনস্বাস্থ্য,

অর্থনীতি ভেঙে যাওয়ার শুরু। অস্তিত্বের এমন বিপন্নতার মুখে দাঁড়িয়ে বহু দেশই লক ডাউন, ক্লোজার, আংশিক কারফিউ এবং যাবতীয় নিত্য জরুরি কার্যবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বাধ্য হয়েছে। লক ডাউনের অর্থনীতিক ক্ষতিকর প্রভাব অনুভূত হওয়া শুরু যা আগামী কয়েকমাস দ্বিগুণ চেহারা নিতে চলেছে।

কেন অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্রই এই সংকটের ধারালো ফলার শিকার? আইএলও বা বিশ্ব শ্রম সংস্থা জানিয়েছে যেহেতু অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চিয়তা কোন নিয়োগকারীর কাছে থাকে না, যেহেতু এই শ্রমজীবী অংশের কোন সবেতন ছুটির অস্তিত্ব নেই, যেহেতু এই শ্রমজীবী অংশের রুজির নিশ্চয়তাও নেই তাই সবচাইতে নির্দয়, কঠিন আক্রমণের মুখে এই অংশই। উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় উন্নত দেশগুলিতে এই সংকটের তীব্রতা কিছু কম। পরিসংখ্যান বলছে গোটা বিশ্বে অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবীর হার ৬১ শতাংশ। উন্নত দেশগুলিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীর হার যেখানে ১৮ শতাংশ, সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অসংগঠিত শ্রমজীবীর হার ৭০ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ প্রতি তিনজন শ্রমজীবীর মধ্যে ২ জনের টিকে থাকা এই অনিশ্চিত কর্মক্ষেত্রে। আমাদের দেশের সংকট আরও তীব্র। কেননা এদেশে শ্রমজীবীদের ৯৪ শতাংশই অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রের অংশ।

২০১৮ সালেই গোটা বিশ্বে অসংগঠিত শ্রমক্ষেত্রে শ্রমজীবীর সংখ্যা ছুঁয়েছিল ২০০ কোটি। গত দু’বছরে সংখ্যাটা খানিকটা বেড়েছে বইকি। যাঁরা কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবীর যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাওয়া থেকে বঞ্চিত, সামাজিক সুরক্ষার কোন মানদণ্ডই যাঁদের জন্য বিচার্য্য নয় এবং অবশ্যই স্বল্প মজুরিতে শ্রম দিতে বাধ্য। এই অংশের শ্রমজীবী এবং তাঁদের পরিবারই যে কোন বিপর্যয়ের পয়লা শিকার। ঠিক যে সময়ে জনস্বাস্থ্যের বেনজির বিপর্যয় নেমে আসে তখন তার বহুগুণ আক্রমণ বহুমাত্রিকতা নিয়ে নেমে আসে এই অংশের ওপর। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতের পরিস্থিতি সবচাইতে বিপর্যয়কর। কেননা বিশ্বের সমস্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতেই সর্বাধিক পরিমাণে অসংগঠিত শ্রমজীবীর হার। এশীয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এমনকি আফ্রিকান দেশগুলির তুলনায় ভারতে অসংগঠিত শ্রমজীবীর হার বেশি। শুধু তাই নয়, ভারতের মতো

জনঘনত্বপূর্ণ দেশে এমন মহামারী সংক্রমণের মোকাবিলায় দুর্বল স্বাস্থ্যবিধিতে এই বিপর্যয় সর্বাত্মক আঘাত হানতে চলেছে।

ভারতের বাস্তবতায় এই ধরনের মানবদেহে সংক্রামিত হওয়া ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো, সেফটি নেট বলতে প্রায় কিছুই নেই। কেননা আমাদের দেশে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা (নির্দিষ্টভাবে বললে শারীরিক বিচ্ছিন্নতা) আরোপিত হওয়ার কোন বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত নেই। সংক্রমণ ঠেকানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে যে পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ করার কথা তা ব্যতিরেকেই বিধিনিষেধ আরোপিত হচ্ছে। অন্য সুযোগ-সুবিধার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল শারীরিক বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করতে ন্যূনতম যে পরিশ্রুত পর্যাপ্ত জল ও সাবানের প্রয়োজন সেটুকুরই নিশ্চয়তা নেই। তার ফলে বিপর্যয়ের প্রাথমিক ধাক্কাতেই এই বিপন্ন অংশের মানুষের রুজি, উপার্জন, খাদ্য লোপাট হয় এবং জীবনহানী ঘটে যায়।

ভারতের সংবিধানের প্রাককথনেই মোটা হরফে উল্লিখিত রয়েছে অর্থনৈতিক সুবিচারের কথা। শুধু তাই নয়, সংবিধানের ২১নং ধারা চিহ্নিত করেছে প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বেশ কয়েকবার বেঁচে থাকার লক্ষ্যে রুজির অধিকারকে স্বীকৃতিও দিয়েছে। এমনকি সংবিধানের ১৯/১-এর জি ধারা যে কোন পেশা বা রুজির অধিকারকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিয়েছে। এর বাইরে সংবিধানের ১৪নং ধারাও সমতার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সংবিধানের ৩৮নং ধারার চতুর্থ বিভাগে নির্দেশাত্মক নীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছে এই মর্মে যে আর্থিক বৈষম্য ঘোচাতে জাতীয় জীবনে সমতা আনতে কল্যাণমূলক কর্মসূচি নিয়ে চলবে। সংবিধানের ৩৯নং ধারা বলছে রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের রুটিরুজির নিশ্চয়তা আনতে নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করবে। শুধু তাই নয়, দেশের সর্বোচ্চ আদালত বারেবারেই জানিয়েছে রাষ্ট্রের নীতি গ্রহণে নির্দেশাত্মক নীতি মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু সম্প্রতি দেশের সরকার করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে সাধারণ নাগরিকদের বিশেষত অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতে পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষের রুটিরুজির অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

কোভিট ১৯ অজুহাত হল মাত্র। কেন্দ্রের মোদী সরকারের পরিকল্পিত নীল নকশা কার্যকর হচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন

লক ডাউনের জেরে দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের রুজি খোয়া যেতে বসেছে। সম্প্রতি সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোড বিল কার্যকর করতে প্রতিটি কোম্পানিকে ৩০০ পর্যন্ত শ্রমিক ছাঁটাই করার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, যে কোন শিল্প ইউনিট বন্ধ করতে (ক্লোজ ডাউন) সরকারি অনুমোদনের কোন প্রয়োজন হবে না। এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর পাশা-খেলা শুরু হয়েছে গোটা ভারতে।

মোদী সরকার অতিমারীজনিত লক ডাউনকে ব্যবহার করছে শ্রমিকদের ওপর আরও নিপীড়ন চালানোর লক্ষ্য নিয়ে, উদ্দেশ্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের খুশি করা। এই মুহূর্তে গোটাদেশে মূর্ত হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু শুধুমাত্র করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জেরে নয়, বরং মোদী সরকারের জন্ম দেওয়া নৈরাজ্যের কৌশলের কারণটাই ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। কোভিট ১৯ সংক্রমণের পয়লা শিকার এই শ্রমজীবী মানুষ শুধু কেন্দ্রের সরকারের নির্মম ভ্রান্ত নীতির কারণে জর্জরিত নয়, তার সঙ্গেই পুলিশ, প্রশাসনের বর্বর অত্যাচার, আক্রমণে এক অনিশ্চিত জীবনের লক্ষ্যে পা বাড়িয়েছেন। কোভিট ১৯ উদ্ভুত ট্রাজিক কাহিনীর দুটি দিক – একদিকে সরকারের দিশাহীন রাজনীতি লক্ষ লক্ষ মানুষকে উপার্জনচ্যুত করেছে, নির্ভরশীল করে তুলেছে খয়রাতির ওপরে; তারা থাকতে বাধ্য হচ্ছেন মানুষের বসবাসের অনুপযোগী স্থানে, যেখানে প্রতিনিয়ত পুলিশ এবং প্রশাসনের দ্বারা তাঁরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত। মায়েরা শিশুদের জন্ম দিতে বাধ্য হচ্ছেন কুঁড়েঘরে, কারণ হাসপাতাল এবং ডাক্তারখানায় পৌঁছবার উপায় নেই। টিবি রোগী এবং হৃদরোগীরা বিনা চিকিৎসায় দিন গুণছেন। শিশুরা ধুলোর মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ স্কুল ও মিড-ডে-মিল বন্ধ। যাঁরা কৃষিক্ষেত্রে বা কারখানায় বা নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা কর্মহীন ও আশাহত হয়ে দিন গুজরান করছেন। এঁদেরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ভিনরাজ্যের বস্তিতে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকের দল। যাঁদের অনেকেই বাড়ি ফেরার অদম্য ইচ্ছের কারণে পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

রাজনীতির এই পাশাখেলায় বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে। যে খেলায় উৎপাদন এবং মুনাফা অর্জনের ঘুঁটি হবে শ্রমিক। যাঁর না থাকবে অধিকার, না থাকবে পরিচয়, না থাকবে প্রয়োজন। শুধু অস্থি-চর্মাবৃত হয়ে সেই শ্রমিক উৎপাদনে

যোগান দেবে। একই সঙ্গে হৃদয়হীন কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে আরও বেশি ছাড় দেওয়া হবে। মোদী সরকার নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীর সম্পর্ককে এক নতুন চেহারা দিতে বদ্ধপরিকর। এই সরকার চারটি শ্রম কোড এনেছে। যার উদ্দেশ্য নাকি শক্তিশালী নিয়োগকর্তার থেকে দুর্বলতর শ্রমিকশ্রেণিকে রক্ষা করা।

কার্যত মহামারিকে সামনে রেখে বেসরকারিকরণ ও শ্রমআইন ধ্বংসের মেগা প্ল্যান। গুজরাটের বণিকসভা আবদার করেছে এক বছরের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন করাই যাবে না! উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকার তিন বছরের জন্য সমস্ত শ্রমআইন বাতিল করেছে। একই পথে হেঁটেছে মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, আসামের বিজেপি সরকার। শুধু বিজেপি কেন, একই পথে হাঁটছে রাজস্থান, পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার। ৮ ঘণ্টা কাজের সময়কে বাড়িয়ে ১২ ঘণ্টা চেয়েছিলেন নারায়ণমূর্তির মত শিল্পপতি। একই বায়না ফিকি, সিআইআই-এর মত বণিক সংস্থাগুলির। শ্রমআইন তুলে দেওয়ার অর্থ কারখানায় ফাস্ট-এইড বক্স, ক্যান্টিন, টয়লেট সবকিছুই তুলে দেওয়া। কার্যত সঙ্কট থেকে বাঁচতে ভারতের শ্রমজীবীকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চতুর পরিকল্পনা পুঁজিবাদের।

সংক্রমণ মোকাবিলায় সঠিক শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে অচেনা পথ চলার নজিরও আমাদের সামনেই রয়েছে। এ প্রশ্নে দেশের অন্যতম সফল রাজ্য কেরালা দিশারী। কোনপথে শুধু দেশের সমস্ত রাজ্যের নজর নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তের নজরে স্বীকৃতি আদায় করে নিল কেরালার বাম সরকার? রাজ্যের নানা প্রান্তে ১৮০০০ ক্যাম্প গড়ে তোলা হয় গেস্ট ওয়ার্কারদের

(পরিযায়ী শ্রমিকদের) জন্য। গোড়াতেই এক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের জন্য ৪৬০৩টি ক্যাম্প খোলা হয়েছিল যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকরা ‘অতিথি’র সম্মান নিয়ে ছিল। এর বাইরে আরও ৩৫টি ক্যাম্প খোলা হয় যেগুলো শুধুমাত্র গৃহহীন ও পরিবার বিচ্ছিন্ন মানুষদের জন্য। গোড়াতেই ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে মূলত শ্রমজীবী মানুষকে সংকটের হাত থেকে বাঁচাতে নামে কেরালার বাম সরকার। পরবর্তী এমন ক্যাম্পের সংখ্যা আরও বেড়ে চলে সে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দরজা খুলে দিয়ে। রাজ্যের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ৪৮৪৫৮ জন রাজ্য লটারির বিক্রেতা যাঁরা ফুটপাতে লটারি বিক্রি করে পেট চালাতেন তাঁদের এককালীন এক হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া। রাজ্যের সমস্ত জায়গায় দিনমজুর, অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকদের এক মাসের বেতন প্রদান। দায়বদ্ধতার শেষ নয় এখানেই, প্রতিটি নাগরিককে রেশনের মারফৎ খাদ্য সরবরাহ করা, ১৪০০-র বেশি কমিউনিটি কিচেন গড়ে প্রতিদিন সেখানে স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করে বিনামূল্যে বিলি করা এবং যেখানে সম্ভব মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে সেই খাবার বিলি করা। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এর সঙ্গেই রাজ্যের যত আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের কিস্তি সংগ্রহ বাতিল করেন। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ফি সংগ্রহ বন্ধের নির্দেশ দেন। চালু করা হয় টেলিমেডিসিন ফেসিলিটি। পুলিশ ও ফায়ার ফাইটাররা মেডিসিন সরবরাহ করেছেন রাজ্যের নানা প্রান্তে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে উন্নত করার পথেই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় নামে কেরালা। এই সেই রাজ্য যেখানে প্রতিটি রাস্তার মোড়ে রাতারাতি ওয়াক ইন স্যাম্পেল কিয়স্ক (ডব্লিউ আই এস কে) গড়ে সংক্রমণ মোকাবিলায় নামা হয়েছে। কমিউনিটি সংক্রমণ ঠেকাতে মাত্র দু’মিনিটে স্যাম্পেল কালেকশন করে রোগ পরীক্ষার পথে নামা। এমন একটা কিয়স্ক যেখানে চিকিৎসক ও রোগী পরস্পরকে না ছুঁয়েই পরীক্ষার কাজ চালানো যায়। যে ভাইরাস সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন ৪০ শতাংশ করে বেড়ে চলেছিল সেই সংখ্যাকে নামিয়ে আনা হয়েছে সাকুল্যে ২ শতাংশে। শুধু তাই নয়, জিপিএস প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই করোনা সংক্রামিত মানুষদের গতিবিধি নির্ণয় করে পরীক্ষার পথে নামে রাজ্য সরকার। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও ডিজিটাল প্রযুক্তি এই কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেরালাতেই সবচাইতে বেশি সংখ্যক মানুষ যাঁরা কোভিট ১৯

সংক্রমণ থেকে সুস্থ জীবনে ফিরে এসেছিলেন। দেশে কোভিট সংক্রমণ থেকে সুস্থ জীবনে ফিরে আসা মানুষের শতকরা হার ১১.২ শতাংশ। এঁদের ৫২.২৪ শতাংশই কেরালার মানুষ। করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ল্যাবোরেটরির ক্ষেত্রেও কেরালা দেশের অন্য রাজ্যগুলির থেকে অনেকখানি এগিয়ে। সে রাজ্যে ১০টি ভাইরাস নির্ণয় কেন্দ্র (ল্যাবোরেটরি) রয়েছে। র‍্যাপিড টেস্ট কিট ডেভেলপ করা হয় থিরুবনন্তপুরমে রাজীব গান্ধী সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজিতে। ভারতে প্রথম কেরালার শ্রী চিত্র তিরুনাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যা টেকনোলজি প্লাজমা থেরাপি শুরু করে। কেরালার কাসারগড় জেলা সবচাইতে বেশি কোভিট সংক্রামিত। সেই কাসারগড় মেডিক্যাল কলেজকে রাতারাতি আল্ট্রা মডার্ন কোভিট ট্রিটমেন্ট সেন্টার গড়ে তোলা হয়। এই কাজটি হয়েছে স্রেফ ৪ দিনে। শুধু তাই নয়, এই কাসারগড় জেলাতেই স্পেশাল কোভিট হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। কেরালা সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে টাটা কোম্পানি এই হাসপাতাল গড়ে তোলে।

সংক্রমণের ধাক্কায় কেন প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের ওপর নেমে আসা আক্রমণের হার তীব্র? অন্য রাজ্যের দিকে নজর ফেলার আগে পশ্চিমবঙ্গেই মিলবে তার নজির। লক ডাউনের ঘোষণার জেরে রাজ্যের সমস্ত চটকলই ঝাঁপ বন্ধ। এরাজ্যের চটকলগুলিতে শ্রমিক কর্মচারীরা লক আউট শব্দটার সঙ্গে খুব বেশি মাত্রায় পরিচিত হলেও 'লক ডাউন' শব্দের সঙ্গে সদ্য পরিচিত হলেন। হুকুমচাঁদ জুটমিলের শ্রমিক রবি রাহা'র কী অভিব্যক্তি এই সদ্য তাঁর জীবনে নেমে আসা লক ডাউন নিয়ে? জানালেন, কারখানা বা জুটমিলে লক আউট নিয়ে আমরা খুবই সন্ত্রস্ত থাকি কেননা লক আউট হওয়ার অর্থই হল শ্রমিকের কাজ চলে যাওয়া। কিন্তু সেই লক আউটের মধ্যেও কাজ খোয়ানো শ্রমিকের জীবনে অন্তত ভিন্ন পরিসরে একটা কাজ জোটানোর সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখন আনকোরা এই লক ডাউনের মর্ম আমরা বুঝছি কাজ চলে যাওয়ার সঙ্গে আর কোন বিকল্প কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাই থাকে না। কামারহাটি জুটমিলের শাহজাদা খান জানিয়েছেন আমরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে যদিও বা বেঁচে ফিরি, আমরা খিদের হাত থেকে বাঁচবো না।

রাজ্যে হুগলী নদীর পূর্ব তীরের ৫২ টি চটকলের মধ্যে ৪৬টি চালু অবস্থাতেই ছিল কোভিট ১৯ ভাইরাস সংক্রমণের জেরে গোটা দেশে লক ডাউন আরোপিত হওয়ার আগে পর্যন্ত। এই চটকলগুলিরই

২ লক্ষ শ্রমিক মজদুর এই মুহূর্তে কর্মহীন অনিশ্চয়তার গর্ভে। এই জুটমিলগুলিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা মূলত তিন ক্যাটাগরির। চটকলের স্থায়ী শ্রমিকের হার সাকুল্যে ৫ শতাংশ যাদের জন্য মাসিক বেতন বরাদ্দ। অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা এবং অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাও পাওয়ার কথা। এর বাইরে ঠিকা অস্থায়ী মজদুরের সংখ্যা ১০-১৫ শতাংশ। এঁদেরও বেতন নির্দিষ্ট রয়েছে বটে কিন্তু রুজির স্থিরতা নেই। এর বাইরে জুটমিলে কর্মরত বিশাল সংখ্যক 'বদলী' শ্রমিক রয়েছে যাঁদের প্রতিদিনের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে সপ্তাহান্তে সামান্য মজুরি মেলে।

এই মুহূর্তে রাজ্যের চটকলগুলিতে দৈনিক উৎপাদনের হার শূন্য। চটকলের শ্রমিক মজদুরদের সংসার চালানোর মতো কোন বন্দোবস্ত নেই। একই সঙ্গে গোটা দেশে এবং এরাজ্যেও চালু লক ডাউন পরিস্থিতিতে এই অনাহার, অর্ধাহারে থাকা শ্রমিক মজদুরদের কাছে ত্রাণ, খাবার পৌঁছে দেওয়ার কোন ব্যবস্থাও নেই। প্রতিদিন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে এই শ্রমিক মজদুরদের জীবন। খুব দ্রুত সরকার যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেয় তবে চটকলের শ্রমিক বস্তিতে মৃত্যুর মিছিল শুরু হবে। এমন পরিস্থিতিতেই হাত তুলে নিয়েছে জেসিআই বা জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া এবং রাজ্যের শ্রমদপ্তর। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সংক্রমণ ঠেকাতে লক ডাউনের পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া নাকি আর কিছুই করণীয় নেই। শুধু চটকল মজদুর কেন, আদ্যোন্ত পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে অর্ধাহার, অনাহারে ধুঁকতে থাকা শ্রমজীবী মানুষ। যে কোন শহরতলীর আনাচ-কানাচে নজর ফেললেই দেখা যাবে কর্মস্থল ছেড়ে মালিক, ঠিকাদার পগার-পাড়, কিন্তু ঝাঁপবন্ধ কারখানার শেডের তলায় যুথবদ্ধ শ্রমজীবী মুখগুলো প্রতিদিন একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে।

ক বি তা

কার জন্য আয়োজন, কার জন্য কথা

ব্রততী ঘোষরায়

কার জন্য আয়োজন কার জন্য কথা
ভুল করে ভুল হয়ে যায় যদি সব
তবুও এই জন্মেই সব আয়োজন সব কথা
কে করে তবুও রঙ্গ কে ই বা পরিতাপও করে
কে বিশ্বাসে হাত ধরে কেই-বা ফিরিয়ে দেয় হাত
তবুও অঢেল সুখ চিত্তলোক এঁকে যায়
এঁকে যায় পরিযায়ী কথা
কার জন্য হাহুতাশ কার জন্য উজ্জ্বল আকাশ ছুঁয়ে যাই
কার জন্য খেলাঘর সাজানো সমস্ত বেলাটা ধরে
কেই-বা বালির ঘরে জ্যোৎস্নার আলাপ শোনায়
সব ভুল সব কথা সব আয়োজন আসন্ন উৎসবে মাতে
সব কথা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফেলে যায় পড়ন্ত আলোয়
তবুও যাবৎ সুখ সুখের রাগিনী পর্দার আড়াল ভাঙে
স্তিমিত প্রদীপে পায় একটু আলোর কথাকলি।

ভূমিকম্প

অপূর্ব নায়েক

এক ধাক্কায় হুড়মুড় করে পড়ে গেল সব
সাজানো স্বপ্ন
গোছানো ঘর
ভালবাসা ঘন

কোন সকাল থেকে
ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছি এখনে

যদি মেলে
যদি পাই খুঁজে
প্যান্ডোরার বাক্স কোনো

বব ডিলানের গানে গানে

দেবানন্দ ভট্টাচার্য

‘হেই, মিস্টার, ট্যাম্বুরিন ম্যান!’
আমাকে একটু গান শুনিয়ে যাও
তোমার গিটার – তা নাকি অগ্নিবীণা!
বুকের আগুনে আমাকে ঝলসে দাও।

পদাতিক যাঁরা, তোমাকে সবাই চেনে
‘দু-বার না-ভাবা’–দ্বিধাহীনতাই ঠিক
লক্ষ্যমুখে পদাতিকদের গান :
‘অনেকটা পথ...’ পেরিয়ে যাওয়া বাকি।

লুঠেখাওয়াদের সংখ্যা অনেক কম
খেটেখাওয়ারাই পৃথিবীর অধিকাংশ
এখনো শিয়রে যুদ্ধ-দামামা বাজে
যুদ্ধবাজরা দানবের চেয়ে হিংস্র।

সময় নিজেকে বদলে নিতেই চায়
বব ডিলানের দিনবদলের গান
এ গান চিরনতুন স্বপ্নে বোনা
নির্দেশ এই – ‘স্বর্গদুয়ারে হানা।’

সাগর সানাই

বিরূপাক্ষ পণ্ডা

পাতার পর পাতায়
কথা ও কবিতা
তোমার স্বরলিপি।

আমার হাত
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া বৃষ্টিদানা
তোমার ঝুমঝুমি।

চরাচরত আকাশ-গঙ্গা
একান্ত ভরসা
উত্তাপ সরণি।

পাটভাঙা শাড়ি
গোপন মাধুকরী
বাজে সাগর সানাই...
এখনো বাজে!

দূরত্ব

তৈমুর খান

হাত দিয়ে ওর হাত ধরি
মনকে কিছুতেই ধরতে পারি না
আমার দিন ফুরিয়ে যায়

দুয়ার খুলেই রাখি
জ্যোৎস্না ঢোকে মনের জানালায়
আমার আকাশটুকু ওকেই শুধু দিই

জলচর পাখি উড়ে গেলে
নিজের নিঃসীম নৌকাখানি দোলে
লণ্ঠনে-মাস্তুলে গোল শূন্য পাক খায়

রোজ আমি বিনয়ের কাছে যাই
রোজ নত মস্তকে করুণার উচ্চারণ শিখি
দেশ ও বিদেশ থেকে বিপ্লবেরা ফিরে আসে ঘর

আমি শুধু দূরে দূরে চলে যেতে থাকি

গল্প

আকাশ আংশিক মেঘলা

হিমি মিত্র রায়

আহা, এমন করে না বাবা, তুমি বড় হচ্ছ না, এমন অসভ্যতা করলে সকলে তোমাকে পচা বলবে তো!

ছেলের চুল আছড়াতে আছড়াতে নাকটা টিপে দিল সর্বাণী।

কী হাসি ছেলের! হাত দুটো দিয়ে তালি দিয়েই চলছে। কী নিষ্পাপ সারল্যে মাখা চাঁদপানা মুখটা অর্কর। অর্কজ্যোতি নন্দী, বাবানের ভাল নাম। সূর্যরশ্মির মত সুন্দর সর্বাণীর ছেলে। মায়ের

মতই হয়েছে দেখতে শুনতে, টকটকে গায়ের রঙ, গোলাপী ঠোঁট। সেই ঠোঁট বেয়ে লাল গড়াচ্ছে, তার মধ্যেই হাসছে খিল খিল করে। মনে হয় সারাটা দিন ওর সঙ্গে খেললে সর্বাণীর মন ভরবে। কিন্তু তা করলে কি হয়? ঘরের কাজ আছে না, রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, মাঝেমধ্যে খুব শরীর খারাপ লাগে। কাজের লোক পাচ্ছে না সেই কবে থেকে। আসলে ঘর থেকে বেরিয়ে যে খোঁজ করবে, তাও হয় না, সময় কোথায় ওর! আর ছেলে মায়ের সংসারে কীই বা অত কাজ, এভাবেই হয়ে যাচ্ছে কোনোরকমে। বাবানের বাবা থাকলে না হয় এটা সেটা বেশি রান্না থাকত, কিন্তু সে চলে যাওয়ার পর বাহারি রান্না আর করে না সর্বাণী।

'চিতল মাছের মুইঠ্যা, পটলের দোর্মা, রুই মাছের কালিয়া, আজকে এই হবে দুপুরে, কই গো, এই নাও বাজার ধরো!'

'হায় রে হায়, এখন এত বেলায় এত জোগাড় করব কীভাবে, তুমি পারোও বটে! জানো না কাজের লোক নেই!'

'তা তোমাকে কাজের লোক রাখতে আমি বারণ করেছি? তোমার নিজের শুচিবাই বাতিক! করতে হবে না, যাও।'

কথাগুলো মনে পড়ে সর্বাণীর। ওদিন দুপুরেই স্ট্রোক করে চলে গেল, একটুও সময় দিল না। খাবারগুলো রাঁধল, তাও খেতে পারল না। তারপর থেকে দুইয়ের সংসার, বাচ্চা মায়ের। জমিজমা ছিল এককালে ওর শ্বশুরবাড়ির। সেই সুদের টাকায় দুজনের হয়ে যায়। আসলে নিজের জন্য কিছুই চায়নি ও, সব বাবানের জন্য জমাচ্ছে। ঘরটারও জরাজীর্ণ অবস্থা, এদিক সেদিক দিয়ে খসে পড়ছে দেওয়াল। কখন ভেঙে পড়ে। ভয় পায় ও, বাবানকে সবসময় চোখেচোখে রাখতে হয়, কোনোসময় রেলিঙের ধার বেয়ে উঠে পড়ে আর পড়ে যায়, ভাবলেই আতঙ্ক হয় ওর। তাই বাইরের বারান্দার দরজা সবসময় বন্ধই রাখে ও, তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে। বাবান এখন ছিটকিনি খুলতেও শিখে গেছে। উফ, এত দুষ্টু হয়েছে না ছেলেটা!

'সুপ্রভাত, কেমন আছেন বন্ধুরা? আজ আমাদের সঙ্গে আছেন সংগীত শিল্পী রুদ্রাণী ব্যানার্জি। তিনি আজ সকালটা তাঁর সুমধুর কণ্ঠে গান গেয়ে ভরিয়ে তুলবেন। আজ বরং বর্ষার গান শুনি আমরা।'

'এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন...
কাছে যাব কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ...'

আহা! কী সুন্দর গাইলেন উনি, সর্বাণীর খুব গানের শখ ছিল, নিজে করতে পারেনি, তাই শুনতে খুব ভালোবাসে। সকালে উঠে টিভি চালিয়ে দিয়ে চা আর দুটো বিস্কুট খায় ও। কেবল টিভি নেই, অত দরকারও হয় না, দূরদর্শনেই কাজ। চলে যায়। গান শোনা দিয়েই তো কাজ শুধু, আর টুকটাক কার্টুন দেখিয়ে খাওয়ায় বাবানকে, নয়ত খুব বায়না করে। যখন কার্টুন দেয় সে সময় চেষ্টা করে খাওয়ানোর।

আচকিম, আচকিম, থাব, আচকিম থাব...।

'উহ, এখন কোথায় আইসক্রিম পাব, কালকে এনে দেব কেমন? দেখ না বাইরে কত রোদ, মামমামের কষ্ট হবে না?''

চোখের পাওয়ারটাও বেড়েছে সর্বাণীর, যাওয়াই হয় না ডাক্তারের কাছে। এখন বেশি বাইরে বেরোতেও ভাল লাগে না, আশেপাশের পরিবেশটা ভাল নয়, একা মহিলা থাকে জেনে অনেকেরই এদিকে নজর, কত চারিদিকে ডাকাতি চুরি হচ্ছে, ফ্ল্যাটের ভেতর খুন তো মাঝেমধ্যেই। পাড়ার ছেলেগুলো কেমন গুণ্ডার মত, বেরোলেই নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে, তাই দরকার ছাড়া বেরোয় না ও।

আচকিম আচকিম...।

হাত পা ছুঁড়ে কাঁদা শুরু করল বাবান। সর্বাণীও পেরে উঠছে না ওর সঙ্গে, খুব তেজ হয়েছে। উপায় না দেখে যেতেই হল আইসক্রিম কিনতে। সকাল থেকে এমনিতেই শরীর ভাল ছিল না ওর, তবুও ছেলের জেদের কাছে হার মানল।

আইসক্রিম পেয়ে খুব খুশি ছেলে। চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে সব, গড়িয়ে পড়ছে হাতে। টিভিতে সিনেমার গান হচ্ছে এখন। বাবানকে দেখতে দেখতে হঠাৎ সর্বাণীর মাথায় চক্কর আসে, সব অন্ধকার হয়ে যায়, বাবানের আইসক্রিম খাওয়া মুখটাও ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যায়...।

মামমাম...মামমাম...ওতো...ওতো...মামমাম...।

বাবান ডেকেই চলে মা'কে, মুখে চুমু দিতে থাকে, চুল টানে, আদরে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু সর্বাণী ওঠে না। আর ওঠে না।

বাবান কাঁদতে থাকে মাকে জড়িয়ে ধরে, খিদে পায় ওর খুব, একসময় পায়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে ও।

২

'আর বলবেন না এমন গন্ধ বেরোচ্ছে ওই ঘর থেকে যে আর থাকা যাচ্ছে না।'

এই দাশ! এদিকে, দরজা ভাঙো!'

‘সরে যান ওদিকে, বেশি ভিড় করবেন না।’

আশেপাশে তখন কয়েকশো লোক জমে গেছে, সবার মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। বেশির ভাগের হাতে মোবাইল তাক করা, লাইভ ভিডিও করছে। অন্য হাতে নাক ঢাকা, দরজা ভাঙা হচ্ছে। পুলিশের নাকেও কাপড় ধরা। ধাক্কাধাক্কিতে একবারেই খুলে পড়ে গেল পুরনো দরজা। ঝুরঝুর করে একপাশের কাঠের টুকরোও খসে পড়ল।

খোলা মাত্রই পচা গন্ধটা আরো তীব্র হয়ে এসে নাকে লাগল, টেকা দায়। মনে হল এক দমকা নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস ঘর থেকে বের হয়ে মুক্তি পেল।

ভেতরটা অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে, কতদিন যে সূর্যের আলো ঢোকেনি, কে জানে। জানালা-দরজা সব বন্ধ।

এদিকে লাইটের সুইচ, স্যায়! দাঁড়ান!

দাশ খটখট করে সব সুইচ ট্রাই করছে। কোনোরকম একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বলল।

এক নজরে চারিদিক দেখে নিল, কিচ্ছু নেই এখানে, ফাঁকা ঘর, শুধু কোনায় একটা জলের ফিল্টার রাখা। নিচে জল পড়ে রয়েছে কিছুটা। পাশের ঘর থেকে হালকা টিভির আওয়াজ ভেসে আসছে।

ওই ঘরটায় হাল্কা আলো, টিভির আলোয় ইন্সপেক্টর সরখেল এগিয়ে যাচ্ছেন, পেছন পেছন দাশ। দম আটকানো অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা যাচ্ছে না, বাইরে ভিড় করে আছে জনতা। তাদের সামলাচ্ছে কনস্টেবলরা। ইন্সপেক্টর সরখেল ঘরে ঢুকলেন।

যা ভেবেছে তাই, বিছানায় ডেডবডি পড়ে রয়েছে কারও। হাল্কা আলোয় স্পষ্ট নয়। লাইট জ্বালালেন দাশ।

গা গুলিয়ে উঠল ওঁর। নতুন চাকরি, সবে সবে জয়েন করেই এটা প্রথম কেস। কে জানত, প্রথমেরটাই এরকম পচা গলা লাশ দেখতে হবে!

‘বাবা রে, পুলিশের চাকরি ভাল না, তুই গেরামের ইস্কুলেই মাস্টারি কর, আমরা বুড়োবুড়ি শান্তিতে থাকতে পারি।’

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলছিল দাশের মা।

‘না মা, আমি পুলিশেই যাব, কী আর আছে এই গ্রামে, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, শুধু সন্ধ্যে হলেই হাতির পাল তাড়াতে যাও। আমার ভাল লাগে না, নতুন কিছু করতে ইচ্ছে করে। গ্রামের সবার মত আমাকে ভাববে না।’

মা আর কিছু বলেনি।

সত্যি ওঁর গা গুলোচ্ছে। গন্ধে ভাত উগরে আসছে। সকালে কী সুন্দর মায়ের পাঠানো কালো ননিয়ার ফ্যান ভাতে আলু মাখা আর সর্ষের তেল কাঁচালঙ্কা দিয়ে পেট ভরে খেয়ে বের হয়েছিল ঠাকুর প্রণাম করে। কে জানত প্রথম দিনই এরকম দেখবে?

কী দেখছ? হে হে, হল তো, পুলিশে চাকরি করবে না? নাও, এবার ডাক দেখি, স্ট্রেচার ঠেচার আনতে হবে।

বিছানায় পড়ে আছে একজন বৃদ্ধার দেহ। বয়স আনুমানিক পঁচাত্তর আশি। শীর্ণকায়। মনে হচ্ছে বিছানায় মিশে গেছে, দু-তিন দিনের লাশ, গরম বলে আরো তাড়াতাড়ি বডি ডিফর্ম হয়ে গেছে। মাছি ভনভন করছে সবখানে।

বডি চলে যাচ্ছে পোস্টমর্টেমের জন্য। তবে মনে হচ্ছে বয়সজনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধার।

হঠাৎ আওয়াজ আসে খুটখুট করে। ইঁদুর ভেবে তাকাতেই চোখ পড়ে খাটের ওপাশে।

দু হাঁটু মুড়ে জুবুথুবু হয়ে বসে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে এক টাকমাথা লোক, বেশ শক্তসামর্থ মনে হল, বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন।

প্রচণ্ড ভয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে। তাকানোটা স্বাভাবিক না। চোখে আলো পড়ায় চোখ কুঁচকে বন্ধ করে আবার সেই ভয়ঙ্কর চাউনি।

মামমাম...মামমাম! উউউ...মামমাম...।

লাল গড়াচ্ছে মুখ থেকে ক্রমাগত, নিস্তেজ শরীরটা কতদিনের না খাওয়া যে! পাশে নোংরা পড়ে আছে এঁটোকাঁটা, একটা ময়লা বালতিও। মনে হয়, ময়লার বালতি থেকে খাবার খেয়েছে। পাশে একটা আইসক্রিমের খালি বাটি আর চামচ পড়ে রয়েছে।

দাশ তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে, জুবুথুবু হয়ে থাকা লোকটাও মুখ হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কত কিছু যেন বলতে চায়।

দাশ চোখ সরিয়ে নিল, কেমন একটা লাগছে! বয়স্ক ছেলেটার মনের বয়স মনে হয় চার কি পাঁচ!

লোকটা আবার বলে উঠল, 'মামমাম, মামমাম, আচকিম আচকিম, মামমাম...।

চালানো টিভিতে এখন দূরদর্শনে আবহাওয়া সংবাদ চলছে। সঞ্চালিকা মিষ্টি গলায় বলে চলছে, 'আজ বিকেল থেকে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে, রাতের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।'

অলঙ্করণ : বিশ্বজিৎ আইচ

প্রবন্ধ

ওয়ার্লি উপজাতি বিদ্রোহ ১৯৪৫-৪৬

মানবেশ চৌধুরী

১৯৪৫–'৪৬, বিশষ করে ১৯৪৬ সালে অনেকগুলি বড় বড় বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান ঘটে আমাদের এই উপ মহাদেশে। সেগুলির মধ্যে সর্বাধিক তীব্রতায় ঘটে নৌ বিদ্রোহ। এই আন্দোলনগুলির ফল হয়েছিল আন্দোলনগুলির সম্মিলিত তুফানে যে ঝড় উঠেছিল, তার প্রতিক্রিয়া সার্বিক আলোচনা করলে, তৎকালীন উৎকট-লোভাতুর মূল দল দুটি, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের ও কৌশলী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজের চেহারা আরও

বেআব্রু হয়। যাইহোক একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক–

"ভারতে, ১৯৪৬ সালের শুরুতে বিকাশোন্মুখ বিষ্ফোরক পরিস্থিতিতে শক্তির বিন্যাস কী ধরনের ছিল তা অবিসম্বাদী স্পষ্টতা নিয়ে উদঘাটিত করে দিয়েছিল বোম্বাইয়ের এই নৌবাহিনীর অভ্যুত্থান ও জনপ্রিয় সংগ্রামে পূর্ণ ফেব্রয়ারি মাসের দিনগুলি।" আজিকার ভারত – রজনী পাম দত্ত।

অন্যান্য আন্দোলন–সংগ্রামের কথা বলতে অনেক পাতার দরকার। কিন্তু তার নির্যাস আমাদের জানতে হবে। তা হলো – এই সময়ের আন্দোলনগুলি জনগণের সংগ্রামে রূপান্তরিত হচ্ছিল। কী জাতীয় কংগ্রেস, কী মুসলিম লিগ-কারও আর সেগুলি নিয়ন্ত্রণে ছিল না। জনগণের এই সকল সংগ্রামে স্বাভাবিক নেতা হয়ে উঠছিল কমিউনিস্ট পার্টি। তাই ওই দুটি দল ছাড়াও ভীত হয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ রাজ। তিন পক্ষই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর তাই তাড়াতাড়ি দেশভাগের মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে গেল। নৌবিদ্রোহ, ডাক ও তার কর্মচারি বিদ্রোহ, সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ ছাড়াও যে সমস্ত সংগ্রামে সে সময় ভারতের দিক দিগন্ত উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সে গুলির কয়েকটি – বাংলার তেভাগা সংগ্রাম, কেরালার পুন্নাপ্রা ভায়ালার সহ অন্যান্য কৃষক আন্দোলন, লেভি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের কৃষক সংগ্রাম, সুরমা উপত্যকার নানকার বিদ্রোহ ও অন্যান্য সংগ্রাম, ত্রিপুরার গণ–মুক্তি পরিষদ-এর দ্বারা সংগঠিত সংগ্রাম, তেলেঙ্গানার মুক্তি সংগ্রাম ও আমাদের আজকের আলোচ্য ওয়ার্লি বিদ্রোহ।

কমরেড গোদাবরী পারুলেকার ছিলেন ঐ আন্দোলনের নেতা। তাঁর লেখা একটি ছোট পুস্তিকা আমাদের হাতে আছে। সেখান থেকে সংক্ষেপে কিছু তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরছি। তার সঙ্গে এই লেখকের কিছু কথা না থাকলে, তা কেমন হয়, তাই তাও থাকছে। গোদাবরীর লিখিত পুস্তিকাটির নাম - Revolt of the Worlis. পুস্তিকাটির প্রকাশক সারাভারত কিষান সভা। এই সংগঠণের সুবর্ণ জয়ন্তি সম্মেলন (পাটনা, ২৫-২৭ এপ্রিল, ১৯৮৬) উপলক্ষে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়।

কী ভাবে সেই সংগঠণ ও সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, তা জানা একজন সাম্যব্রতী কর্মীর কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। এভাবেই ভূমিকায় বলছেন আরেকজন প্রমুখ সেনাপতি কমরেড হরকিষেন

সিং সুরজিত। যে আদিবাসীরা চরমভাবে শোষিত হয়ে পেছনে পড়েছিল, তারাই কী ভাবে লালঝাণ্ডা তথা কিষানসভার ছায়াতলে মিলিত হয়ে শত ষড়যন্ত্র, তাদের ঐক্য সংহতিকে বিনষ্ট করার চক্রান্তকে প্রতিহত করে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল, তার কাহিনী এই ছোট্ট পুস্তিকায় বিধৃত হয়ে আছে।

পশ্চাৎপট – মহারাষ্ট্র রাজ্যের একটি জেলার নাম থানে। এই জেলায় দাহানু, তালাসারি, জওহর, ওয়াদা, নোগাদা, পালঘর ইত্যাদি তালুক বা থানা বা ব্লক।

এখানকার পর্বত শ্রেণির চিরসবুজ বনাঞ্চলে বাস করে আসছেন বিরাট সংখ্যক উপজাতি মানুষ – ওয়ার্লি, যাদের আদিবাসী বলা হয়।

সেখানে ছিল না কোন সড়ক, ছিল না চলাচলের কোন বন্দোবস্ত। আর না ছিল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না চিকিৎসালয়। এ ছিল এমন একখণ্ড পৃথিবী, যেখানে ছিল অকল্পনীয় কষ্ট, দারিদ্র্য, নিঃস্বতা, অবনত জীবন, ব্যারাম, শোষণ ও মৃত্যু। এসব ফুলে ফেঁপে উঠেছিল।

অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ওয়ার্লিরা উল্লিখিত বনাঞ্চলের সমস্ত জমির মালিক ছিল। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে তারাও সুন্দর জীবন যাপন করত। বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে তারা সুখে দিনাদিপাত করতো।

কিন্তু ব্রিটিশ রাজ শুরু হবার পর, তাদের হাত ধরে বাইরে থেকে হিন্দু-পারসি, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ অনুপ্রবেশ করল। তারা

এল ব্রিটিশ রাজের সহায়তায়, ব্রিটিশ রাজের সহায়ক হয়ে। এই বহিরাগত মানুষদের মধ্যে শিক্ষিত, ব্যবসায়ী ও বণিকরা ছিল।

এখানকার ওয়ার্লি আদিবাসীদের নিরক্ষরতার ও সরলতার সুযোগ নিয়ে ওরা যেন ডাকাতি করতে শুরু করে দিল। ওদের যাবতীয় সম্পত্তির মালিক ক্রমে হয়ে গেল ঐ বহিরাগতরা। একসময় তারা পরিণত হল জমিদারে।

বহিরাগতরা সমস্ত জমির মালিক হবার সুবাদে ওয়ার্লিদের দমিয়ে রাখতে জঘন্য সব অপরাধ করতে শুরু করল। ওয়ার্লিদের সঙ্গে তাদের সংঘাত হল। কয়েকজন মারাও গেল বহিরাগতদের মধ্যে। কিন্তু তারপর ওয়ার্লিদের গাছ কেটে, চাবুক মেরে, অন্যান্য নানারকম অত্যাচার করে তাদের ওরা সাময়িকভাবে পরাজিত করল। বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের টিপছাপ নিয়ে ওয়ার্লিদের ঠকানো হলো। এভাবে আদিবাসীদের সমস্ত জমি বহিরগত – জমিদার ও অন্যান্যদের উদরে চলে গেল।

কাউকে কাউকে কিছু খারাপ জমি দিয়ে তাদের দিয়ে বেগার খাটানো শুরু হল, নির্দয় বর্গাদার প্রথা চালু করা হল।

এক কথায়, বঙ্গ–বিহারের সীমান্ত জুড়ে সাঁওতাল আদবাসী অধ্যুসিত এলাকা, তাদের আপন ভূবন দামিন ই কোহ, অধুনাকালের সাঁওতাল পরগণায় সম সময়ে যে অত্যাচার হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে ১৮৫৫ সালে বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল, তেমনই অত্যাচার এখানে কায়েম হয়েছিল থানেতেও, তবে সেখানে ঊনবিংশ শতাব্দিতেই ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, আর ওয়ার্লিতে হয়েছিল তার প্রায় একশত বছর পরে।

তবে একটা কথা বলতে হবে, মহনীয়তায় অনেক বড় বিদ্রোহ হলেও, সাঁওতাল বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি। সময়টা ছিল বিপ্রতীপ। কিন্তু থানে জেলায় এখনও ঐ এলাকাগুলেতে লাল ঝাণ্ডার সংগঠন ও সংগ্রামের ধারা ধারাবাহিকতা বিদ্যমান।

যাইহোক, আমরা ওয়ার্লি আদিবাসীদের লড়াইয়ের কথায় ফিরে আসি।

সংগঠন দানা বাঁধছে, সংগ্রামও শুরু হচ্ছে, তখনই দেখা গেল 'আদিবাসী সেবা মণ্ডল' নামে একটা সংগঠন গজিয়ে উঠেছে। আসলে এটা একটা বিভেদকামী সংগঠন । আন্দোলনকে বিপথগামী

করার জন্য। শোষণ ব্যবস্থা, কায়েমী স্বার্থের রাজত্ব কায়েম রাখার এই সংগঠন তাকে উচ্ছেদ করা হল, এলাকাগুলিতে সারা ভারত কিষাণ সভা গড়ে উঠবার পরে। মানুষ আসল নকলের ফারাক বুঝতে পারল।

এখানে আরও একটা কথা বলার আছে। তখন ওপরে ব্রিটিশ শাসন থাকলেও, প্রাদেশিক সরকার ছিল জাতীয় কংগ্রেসের। তারা কিন্তু ওয়ার্লিদের ন্যায্য দাবির বিরোধিতা করতো।

পাঠক নিশ্চয়ই দেখতে পারছেন, তেভাগার সময় বৃহত্তর বাংলায় ছিল মুসলিম লিগ সরকার। তারাও ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল। দল হিসাবে মুসলিম লিগ, কংগ্রেস উভয় দলই বিরোধী ছিল তেভাগার। হিন্দু মহাসভাও বিরোধী ছিল। আর থানেতে যেমন বিভেদবাদী 'আদিবাসী সেবা মণ্ডল' ছিল, এখানেও তেমন ছিল ক্ষত্রীয় মহাসভা।

থানের বিভিন্ন এলাকায় যখন পারুলেকর দম্পতি, গোদাবরী ও শ্যামরাও পারুলেকর এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে সংগঠন ও সংগ্রাম দ্রুত গড়ে উঠছে, সেসময় মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কিষান সভার সম্মেলন তিতওয়ালাতে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে থানে থেকে ১৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হলেন। সারা মহারাষ্ট্র থেকে ঐ সম্মেলনে ৭হাজার জন উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানকার প্রতিনিধিরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে এলাকায় ফিরলেন।

যে নারী তাঁর যাবজ্জীবনে কয়েকটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তিনিও বাকপটু হয়ে উঠলেন। গোদাবরী তাঁর নাম জানিয়েছেন – মায়া ধানগায়েন্দা।

দাবিসনদ নিয়ে গ্রামে গ্রামে লড়াই শূরু হল। ১) এক টাকা বার আনা করে দৈনিক মজুরি না দিলে কেউ জমিতে মজুর দেবে না। ২) জমিদারের জন্য কেউ মিনিমাঙনায় মজুর দেবে না। ৩) জমিদারের সঙ্গে কেউ একা একা দেখা করবে না। ৪) সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

এই কর্মসূচী ও শ্লোগান ওয়ার্লিদের বিপুলভাবে উদ্দীপিত করল। দিকে দিকে লড়াই আর লড়াই। দাস প্রথা রদ হয়ে গেল। ওয়ার্লিরা মজুরি দাসত্ব থেকে মুক্ত হল। মনে রাখতে হবে, এসব কোন মামুলি ব্যাপার নয়। ওয়ার্লিদের জন্য তা একটা অভ্যুত্থানের মত ছিল।

তারপর একের পর এক বিজয় অর্জিত হতে থাকল। একটা

কথা বলার, কিষানসভা তাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, কিন্তু এ সংগ্রামগুলি ছিল ওয়ার্লিদের নিজেদের দ্বারা অর্জিত।

তারা আরও বিজয়ের জন্য হরতালের ডাক দিল। তা ভাঙার অপচেষ্টাও যথারীতি চলল। কিন্তু শাসক–শোষক পরাজিত হল। বন্ধনহীন মন নিয়ে তারা লড়তে থাকল। শোষক-শাসক শক্তির সন্ত্রাসের ঝড় বয়ে গেল তাদের ওপর দিয়ে। অনেক মামলা রুজু হল। নেতৃত্বের তো বাদ যাবার কথা নয়, গেলেনও না। শ্যামরাও পারুলেকর আদালতে নিজের জন্য সওয়াল নিজেই করলেন। কংগ্রেস সরকারের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ রিপোর্ট দিল, এই লড়াইয়ের পেছনে আছে, রাষ্ট্রশক্তি দখলের উদ্দেশ্য নিয়ে কমিউনিস্টরা। এদের নেতা এক কমিউনিস্ট নারী। ইঙ্গিত করা হল কমরেড গোদাবরী পারুলেকরকে।

কিন্তু লড়াই কী আর থেমে থাকে। নতুন দিগন্তের দিকে তা ধেয়ে চলল। একসময় ঘাস কাটা, গাছ কাটার দৈনিক মজুরিও বাড়াতে বাধ্য হল তারা। বাধ্য হল জমির খাজনা অনেকাংশে কমিয়ে দিতে।

আগেই বলা হয়েছে, ছোট বড় নানা লড়াইয়ের মধ্যে থানের ওয়ার্লিরা কমিউনিস্ট পার্টি ও কিষান সভার নেতৃত্বে পথ হাঁটছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের প্রেরণা ১৯৪৫ – '৪৬ সালের বিদ্রোহের সফলতা। যার প্রধান নেত্রী ছিলেন শ্রেণী শত্রুদের ত্রাস 'নারী কমিউনিস্ট' কমরেড গোদাবরী পারুলেকর।

প্রবন্ধ

দেবেশ রায় ও বাংলা উপন্যাসের দায়

শুভময়

১.

তাঁকে নিয়ে আমাদের উদ্‌বিগ্ন থাকার খুব একটা পরিসর দেননি দেবেশ রায়। বার্ধক্যজনিত কোনো অশক্তিকে ভুগছিলেন না। দেশশুদ্ধ এই তালার নীচে চাপা-পড়া সময়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁকে নিয়ে শঙ্কার কাঁপন ছিল না তেমন। অথচ দু'দিনের অবনতিতেই নিজে হেঁটে নামলেন না বল্মীক-এর চারতলার সিঁড়ি দিয়ে। ১৪ মে রাত ১০টা ৫০-এ সকল নিষ্পত্তির পর, ১৫ তারিখ রাত পৌনে আটটা নাগাদ কয়েক মিনিটের জন্য একবার ফিরেছিলেন বটে, বল্মীক-এ, কিন্তু নিজের পায়ে তরতর

করে চারতলা অবধি সিঁড়ি ভাঙবার জন্য তো নয়।

২.

এই গদ্য, নিশ্চয়ই, রীতি অনুযায়ী দেবেশ রায়ের প্রয়াণলেখ। কিন্তু রীতিকে মান্য করে এই লেখ তাঁর সাহিত্যকীর্তি পরিক্রমণের দিকে হয়তো এক চিলতেও হাঁটতে চাইবে না। দেবেশ রায় কথাকার। কথাকার দেবেশ রায়। তাঁর এই পরিচয়ের ছাঁচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সযত্নে তার কুলুঙ্গিত রেখে দিয়েছে অনেককাল হল। যযাতি থেকে যোগেশ মণ্ডল পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসের যে বিস্তীর্ণ কথাজমিন, 'দুপুর' ছুঁয়ে পার হয়ে তাঁর গল্পের যে চরাচর, তার দিকে চোখ রেখে ভারতীয় সাহিত্যের বিদ্যার্থী গবেষক ভাবুকরা বারংবার তাঁর কীর্তির মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করবেন, মোহিত হবেন।

সে দেবেশদা-র নিজের অর্জন।

কিন্তু সবার জন্যে, তাঁর অনুজ সব কথাকারের জন্য, সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যের জন্য আর একটি অর্জন হাসিল করে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলা উপন্যাসের সূচনার ইতিহাসকে খানিকটা অস্বীকার করে; উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে আঁতিপাতি করে; উপন্যাস নিয়ে নয়া তত্ত্বের অবয়ব নির্মাণ প্রয়াসে; বাংলা উপন্যাসের এটি অংশ নিয়ে নিয়মিত প্রকাশ্যে আহ্লাদ উচ্চারণ করে, ঢাক পিটিয়ে, বাংলা উপন্যাসকে হিড়হিড় করে অন্যতর একটা পথে পথ দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি।

কতটা পেরেছেন, সে দায় তাঁর একার ছিল না। ছিল আমাদের অনেকের, যাঁদের উপর তিনি ভরসা করেছিলেন।

কতটা পারবেন, সে দায় তো ১৪ এপ্রিলের পর আর তাঁর রইলই না।

আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি, তাঁর হিরন্ময় প্রগল্‌ভতায় কোনো বিরাম ছিল না। ঘাটতি ছিল না।

২.

একগুচ্ছ কথাকারকে নিয়ে এক সমাহারের কৌমপতি যেন ছিলেন তিনি। সেই কৌমের নেহাত এক প্রান্তিক মানুষ হয়েও তিনি আমাকে আত্মীয়তা দান করেছিলেন, নেহাত অন্যতর এক কারণে। আমার কাঁধের ওপর, পুবের বারান্দায় বসে আছেন তিনি। তাঁর

হাত। মর্মর স্বরে তিনি বলে উঠছেন, শুভময়কে আমি ফেরাতে পারি না, কিছুতেই পারি না। এমন প্রশ্রয় কতশতবার পেয়েছি, লেখক-যোগ্যতার কারণে নয়, আমি স্থির জানি– অন্যতর এক কারণে। আমাকে কাছে পেলে তিনি বৃহত্তম এক আত্মীয়তার একজনকে পেয়ে যেতেন। কমিউনিস্ট পার্টির আত্মীয়তা। কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের ক্ষতগুলিতে তিনি হাত রাখতেন, আবার বড়ো আত্মীয়তার আস্বাদেও প্রাণময় হয়ে উঠতেন যেন।

কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের যে ক্ষত, আমার জীবনে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না কখনো। আমার জন্মের বছর দেড়েক আগেই ভেঙেছে পার্টি। তাছাড়া আমি যে অঞ্চলে বড়ো হয়েছি, সেই বসিরহাটের পশ্চিম গ্রামাঞ্চলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নেতাদের সঙ্গে আদি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সম্পর্ক খুব খরতায় পৌঁছায়নি।

(কোনো প্রয়াণ কথনে বা লিখনে প্রয়াত মহাজনের স্মৃতি ও কৃতি যাপনের অবয়ব জুড়ে প্রায়শই কথক ও লেখকের 'আমি' প্রায় সমভাগে উঁচিয়ে উঠে বড়ো কুৎসিত কদাকার দেখায়। পাঠক মার্জনা করবেন শ-দেড়-দুই শব্দ জুড়ে সেই অপকর্ম ঘটে গেল, নিরুপায়। এবং এও জানি, আরও একবার সে অপরাধ ঘটবে। এই লিখনের উপান্তে। বাদবাকিতে সংযমের প্রতিজ্ঞা রইল।)

কিন্তু দেবেশদাকে ভাঙনের পর সম্পর্কের সেই ক্ষত ও ক্ষতি সইতে হয়েছিল। শারীরিকভাবেও বলতেন প্রায়শই সে কথা। এবং ক্ষত ও ক্ষতি জীবনের কোনো স্তর অবধি ছিঁড়ে ফেলতে পারে, তার আখ্যান রচনা করেছেন দেবেশ রায়ের সত্তার প্রায় অপর নাম– দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের মতো কাউকে কাছে পেলে তাঁর হয়তো মনে পড়তো সেই না-ভাঙা সংসারের সুখের কথা এবং অপিচ এক বড়ো সংসারের অহংকারের কথা। কথাকার দেবেশ রায় নিরন্তর বলে এসেছেন, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ফলন। বলছেন :

আমি খুব ছোটবেলা থেকে কমিউনিস্ট পার্টি করছি। কমিউনিস্টদের মধ্যেই বারবার আছি। কখনো বাইরে থাকিনি। আমি প্রথম অ্যারেস্ট হয়েছিলাম ১৪ বছর বয়সে, ১৯৫০-এ, কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি হলে।

এরপর তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙনের কথা বলবেন, বলবেন জলপাইগুড়ি শহরে তাঁর একা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্ত তারপর মোদ্দা যে কথাটা বলবেন, তা হল : 'কমিউনিস্ট পার্টির

ভিতরে থাকার ফলে খাদ্য সংকটের ফলে, লোকজনের ভিতরে ঢুকে যাওয়ার ফলে নানারকম মেলামেশার ফলে এখন আমি হয়তো লেখায় কোনো কোনো সময় খুব করুণ এবং খারাপ অবস্থায়ও রসিকতা করে ফেলতে পারি। এটা আমার পক্ষে সম্ভবই হত না যদি আমি কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর দিয়ে না আসতাম।'

তাঁর এইসব কথোপকথন দুই যশস্বী সাহিত্যবোদ্ধা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং এসব কথাবার্তার মূল ঝোঁক ছিল আখ্যানের বদল ও নতুন আখ্যানের নির্মাণ নিয়ে। সেখানে ওঁরা ঢোঁড়াইচরিতমানস-কে একটা ব্রেক ধরে ক্রমশ সেই বাঁকবদলের একটা হদিশ পেতে চাইছিলেন দেবেশ রায়– মফঃস্বলি বৃত্তান্ত থেকে ক্রমশ তিস্তাপারের দিকে। সেখানেও তিনি পুরো কৃতিত্ব দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিকেই, '... কথাটা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে থাকা ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ছাড়া আমার বিষয়-সংকট কাটত না। আমি রাজবংশী ভাষা রাজনীতির প্রয়োজনে শিখেছি। এবং তিনি বারংবার স্পষ্ট করতে চেয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টিতে না থাকলে তাঁর আখ্যানের মুক্তি ঘটত না। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ বছর আগের এই সাক্ষাৎকারটিতে দেবেশ রায়কেই উদ্ধৃত করেই 'আমার কাছে...মার্কসবাদ বিনা কোনো আধুনিকতা নেই'– দেবেশ রায়ের এই ধ্রুবপদ পুনরুচ্চার করে আরও একবার তাঁকে বাজিয়ে নিতে চেয়েছেন।

ব্রেখট বলছেন, তিনি তাঁর নিজের নাটক বুঝতে পেরেছেন মার্কস-এর ক্যাপিটাল পড়ার পর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি, তাতেই আমার কাধে ধরা পড়ে গেছে যে আমার সৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি– জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে নেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।' এর সঙ্গে একটি দ্বান্দ্বিক চেতনরেখা অবশ্য যোজনা করেছেন মানিকবাবু : 'মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কেন সাহিত্য করতে নেমেছিলাম ভেবে আত্মগ্লানি বোধ করলে সেটা মার্কসবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধেই যাবে, যান্ত্রিক একপেশে বিচারের সৃষ্টি হবে আরেকটা বিভ্রান্তির ফাঁদ।'

দেবেশ রায় জেনেছেন, মার্কসবাদই ছিল তাঁর বিষয়-সংকট মুক্তির একমাত্র পথ। মার্কসবাদ বিনা কোনো আধুনিকতা নেই।

কিন্তু এগুলোই আমাদের শেষ কথা নয়। শেষ কথা অন্যত্র। কারণ মার্কবাদকেই বিশ্ববীক্ষা মেনে সাহিত্য করতে এসেছেন বাংলা সাহিত্যে দেবেশ রায় একক নন। ভারতীয় সাহিত্যে এবং বিশ্ব সাহিত্যেও সে উদাহরণ সুপ্রচুর।

বাংলা কথা সাহিত্যে সেইখানেই তিনি একক, যখন তিনি আমাদের উপন্যাসের জন্যে গড়ে নিতে চাইছেন বাংলাদেশের নিজস্ব নন্দন, এবং সেই পথে সমবেত করতে চাইছিলেন এক স্রষ্টাযাত্রীদল। না, অনুযাত্রীদল নয়। দেবেশ রায় তাঁর অনুজদের নিজের থেকে বেশি শ্রদ্ধা করা সমীহ করার এক তরিকা দাঁড় করিয়েছিলেন। আসলে বাংলা উপন্যাসের নিজস্ব নন্দনে তিনি সচল রাখতে চেয়েছিলেন এক যাত্রীদল পরম্পরা।

এবং এই কাজে প্রথমেই যেটা তাঁকে করতে হয়েছে, বাংলা উপন্যাসের শুরুয়াতের ইতিহাসকে খানিকটা অস্বীকার করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গটি খানিকটা দীর্ঘ। ফলে আমরা পাশ কাটিয়েও যেতে চাইব। আর অস্বীকার করতে হয়েছে বহুলাংশে তাঁর নিজের পাঠ অর্জনকেও। তিনি বলতেন, পাঠক হিসাবে তিনি ক্লাসিসিস্ট। গ্রিক নাট্যকাররা দান্তে, শেকসপিয়র, বালজাক, দস্তয়েভাস্কি, তলস্তয় পরবর্তীকালের টমাস মান ছিল তাঁর পাঠ তালিকায় প্রিয় মুখ তখনো প্রস্ত পড়িনি। একদিন একথা জেনে শীতল তিস্কার হেনেছিলেন। অথচ এই তিনিই সপাটে বলে দেন, ‘বিদেশি মডেল আমাদের গল্প উপন্যাসের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেই মডেল আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।’

আমরা যখন প্রাণপণে বাখতিন পড়ছি, দেখেছি আমাদের আগে আগেই তিনি পড়ে ফেলছেন। এবং পড়ার পরও সেই তাঁর এক গোঁ— বারবার পশ্চিমী মডেল বা তত্ত্ব আমাদের ভুল পথে নিয়ে গেছে। গাড্ডায় ফেলেছে। অথচ অন্যত্র (‘বাংলা আখ্যানকাব্যে নিহিত উপন্যাস উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে, ১৯৯৪) তিনি স্বভাবতই মেধায় নির্ণয় করে নিয়েছেন বাখতিনের ‘উজান যাত্রা’, আধুনিক উপন্যাসের নান্দনিক সূত্রকে আরও নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনেই। ঠিক যেমন তিনি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ন্যায্য নন্দন খুঁজবার জন্যে বারংবার চলে যান মঙ্গলকাব্যে, এমনকি আলালের ঘরে-ও’, এবং সেখানেই খুঁজে পান বাখতিন নির্ণীত উপন্যাসের বহুস্বর বিবরণ।

সুতরাং অমর মিত্র যখন অশ্বঘোষ বা কালিদাস অন্বেষণ করে,

ভেঙেচুরে ওলোটপালট করে নভেলাইজেশনের একটি রাহা খুঁজছেন, রামকুমার মুখোপাধ্যায় যখন রাঢ় বঙ্গের লোকস্বর দিয়ে নির্মাণ করছেন দুখে ক্যাওড়াকে, নলিনী বেরা যখন কী প্রতিস্পর্ধায় প্রকট করছেন শবরচরিত। আফসার আমেদ যখন মুসলমান সমাজের আঁতের কথা নিয়ে উপন্যাস করতে খুঁজে পেয়ে যাচ্ছেন কিসসা চলন, তাঁর আহ্লাদের অবধি থাকত না।

দেবেশ রায় উপন্যাস লেখার দায় শেষ করলেন।

দেবেশ রায় উপন্যাস লেখানোর একটি দায় গ্রহণ করেছিলেন বাংলার ন্যায্য নন্দনে উপন্যাস লেখানোর সেই দায়কেই তিনি মহাদায় মেনেছিলেন।

সেই মহাদায় তিনি থামাননি। সেই মহাদায় তিনি পালন করতে পারছেন কি পারছেন না, তা ঠিক করবেন অমর মিত্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, রামকুমার মুখোপাধ্যায় কিংবা সৈকত রক্ষিতরা।

বই

ছক ভাঙা সময়, অচেনা অন্ধকার

রাহুল চট্টোপাধ্যায়

জীবনের ছকভাঙা রূপটাকে বুঝতে পারলে সবকিছু কেমন সরল হয়ে যায়, যদিও জীবনটা বড়ো জটিল, বহুমুখী তবুও লেখক যখন এ জীবনকে দেখেন তখন কোথাও একটা নতুন কিছুর খোঁজ তিনি পান, চেনা জীবনের অচেনা অন্ধকার আলোকিত হয়ে ওঠে। সমীর রক্ষিতের অনুগল্পগুলি পড়তে পড়তে এমনি ছকভাঙা সময় আর আর অচেনা অন্ধকারের খবর পাওয়া যায়, মনে হয় লেখক যেন খুব ধীরে জীবনের অলিতে গলিতে ঘুরছেন, আলো ফেলছেন, আবিষ্কার করছেন।

আমরা আনন্দকে চিনলাম, কিশোর আনন্দের দ্রুত হাত বাটনা বেটে চলেছে, টিউবওয়েল থেকে জলভরা কলসি বয়ে আনছে তার শরীর, বাসন মাজছে তার দুটি হাত—কিন্তু গান গাইছে তার মন, বই-খাতা উল্টে দেখছে তার চেতনা। শৈশব স্বপ্ন, ভালোলাগা সব মিশে তৈরি হয়ে ওঠে আনন্দ—অন্ধ মা তার কাঠমিস্ত্রি, বাবার মধ্যেও যেন বেড়ে ওঠে এক চিরন্তন সত্য—সত্য সেই নাম—‘আনন্দ’, আর তারই মধ্যে আগামীর কথা দিন যায় কথা থাকে। (দিন যায়)।

সাত বছর কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে রেস্টরেন্টে চায়ের দোকানে নিজেকে ভাড়া খাটিয়ে পাঞ্জা একদিন চোর অপরাধ নিয়ে হরি সাধুর দোকান থেকে বিতাড়িত হল, গায়ে তার গেঞ্জি, পরনে হাফপ্যান্ট। পরাজয়ের গ্লানি মেখেও তার চোখের কোণে খেলে যায় জ্যোৎস্নাময় স্বপ্ন একদিন সে বড়ো হবে, শরীরে যৌবন আসবে, তার পাঞ্জা দুটো বড় হবে, চওড়া শক্ত হয়ে থাবার আকার নেবে, সেদিন সে আবার হরি সাধুদের কাছে যাবে। এক বিস্ময়কর স্বপ্নমেশা প্রতিবাদী চেতনায় নিজেকে নতুন করে দেখার আগ্রহে পাঞ্জা জিন্নতর হয়ে উঠেছে। (পাঞ্জা)।

ক্ষুধা, অভাব অনটন অস্তিত্ব সংকটের মাঝে নির্বাক মানুষের

কথা আমরা শুনি ‘অপুষ্টিজনিত’ গল্পে। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর যেন কালো আক্ষরের মাঝে নীরবে ঘোষরণা করে সমাজের বিক্ষুব্ধ অংশের কথা–

সাতদিন সে ঘাসপাতা সেদ্ধ খেয়েছে, শেষ দুদিন তাও জোটেনি। দিনরাত কাঁদাকাটা করতো খোনা সুরে, আর কোনদিন কাঁদবেনা পানু, তার মাকে বলবে না খেতে দে মা! ছেলের মৃত মুখের দিকে নির্জলা তাকিয়ে ছিল তার মা। তার চোখেও কোথাও জল নেই।

সমগ্র ভাবনার মাঝে একটাই শব্দ উচ্চারণ ‘সরকার, বলেছেন অনাহাতে কোনো মৃত্যুর খবর রাজ্যের কোথাও থেকে পাওয়া যায়নি’–এই দায়হীনতা সকল মৃত্যুর মাঝে বড়ো করুণ হয়ে বেজে ওঠে। এমন ভাবেই অভুক্ত ভূতি চরণামৃতকে চেটেপুটে খায়, চরণামৃত খাওয়া শেষ হলে ভূতি ভাত চায়–‘দুটি ভাত দিবিনি বাবা, বড় খিদা তার এই চাওয়া গভীর রাতে মিশে যায় তার শরীরের সঙ্গে। মন্দিরের বাঁধানো চাতাল ভাতর গন্ধের মাঝে নীরব দর্শক হয়ে ভূতিকে জড়িয়ে রাখে, অভূত প্রশ্নচিহ্ন আঁকা হয়–ক্ষুধার রাজ্য, মনুষ্যত্বের আকাল, ধর্ম, দেশ, আচার-অনাচার ইত্যাদিকে।

‘বিস্তৃত বিপুল খেলা’ এখানে এক ক্ষুধার কথা। কাদু আর বনমালীর জীবন যেন এই খাওয়া না খাওয়ার অদৃশ্য সম্পর্কের মাঝে সমাজমনকে প্রতিবিম্বিত করে। ক্ষুধা ও খাদ্যের সম্পর্ক ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কের বৃহত্তর চালচিত্রে নতুন ভাষা পায়। লেখক একটা গভীর অনসন্ধিৎসা নিয়ে সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রাপ্তিকতাকে তুলে ধরেছেন।

‘লক্ষ্মী’ গল্পে জমি হারানোর বেদনা। জমির মালিক জগৎ একটি মজুর চাষী হয়ে যায়। শ্রেণিভাবনার এ এক জ্বলন্ত বাস্তব চিত্র।

‘রামদেউ’ এক আশ্চার্য গল্প। বড়বাবুর বাড়ির গেট আগলাতে আগলাতে হাড় জিরজিরে ভিখিরিদের গেটের বাইরে বের করে দেয় সে। সাদা দীখল ঝকঝকে ক্যাডিল্যাকের পিছনে কোথায় হারিয়ে যায় ভিখিরিগুলো, আলো পিছলানো ব্যাটনের তাড়ায় কচুরি পানার মতো ছিটকে যাওয়া ভিখিরির দলকে দেখে রামদেউর মনে প্রশ্ন জাগে–‘পৃথিবীর মানুষ সবাই সুখে নেই কেন?’ ছোটো ছোটেক বিষয় কত তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে গল্প গুলিতে, ‘রেলগাড়ি’ গল্পটির কথা রলা যায়। একটি মেয়ের রেলকামরার ফার্স্টক্লাসে ওঠা মৃত্যুর নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। ট্রেনের ফার্স্টক্লাস শ্রেণিবিভক্ত সমাজের

প্রতীক হয়ে যেমন শোষণ ও মৃত্যুকে প্রতীকীকৃত করে, তেমনি তালাগাছের সারি সারি মাথা উঁচুকরা মানুষ আর তেলেঙ্গানার প্রতীক হয়ে ওঠে। বিষয়ধর্মে সমাজ বাস্তবতার সুক্ষ্মতিসুক্ষ্ম বোধ যেন বিশ্ব ইতিহাসকে খুঁজে পেতে যায়। তখন গল্প আর গল্প না থেকে হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ সমাজের ইতিকথা। 'গণেশ দুধ খায় না খায় না' এমনই এক সময়নির্ভর সংস্কার বিরোধী শ্রেণিচেতনার গল্প। মূর্তি গণেশকে দুধ খাওয়ানোর জন্য জেগে ওঠে সারা ভারত, আর সেই ভারতের বুকেই দুধের অভাবে মারা যায় কত গণশা, মায়ের কোল আর ভারতবর্ষ যেন বিস্ময়কর এক সম্পর্কে একাত্ম হয়ে যায়। উভয়ের বেদনা এক অকৃত্রিম বিচ্ছিন্নতাবোধে নিবিড় ভাবরূপ প্রাপ্ত হয়।

এমন বেশ কিছু গল্প অকৃত্রিম নিবিড় এক জীবনবোধে অম্লান। 'আগুন রঙের বেনারসী' সাধারণ মানুষের অসাধারণ ভালোবাসার কাহিনী, 'আলিবাবা' গল্পের একজন সবজি বিক্রেতা ও তার ছেলের জীবন আমাদের ভাবায়। গল্পগুলির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি সম্পর্কের মূলে নিহিত সত্যকে প্রকাশ করে।

বেশকিছু উল্লেখযোগ্য গল্প আছে, প্রতিবাদে মানবিক প্রত্যয়ের দৃপ্ত উচ্চারণে সেগুলি, ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, 'অন্তিম সংলাপ', 'ভারতী মাহালি', 'নিসার আমার কেউ নয়' প্রভৃতি গল্পগুলি আমাদের চেতনাকে আলোড়িত করে। 'দুর্গা ও মহিষাসুর' গল্পটিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। প্রতিটি গল্পে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে আমাদের ভাবনাকে আন্দোলিত করেছে।

ব্যক্তি মানুষ কখনও একক ব্যক্তি কখনও বা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অংশ হিসাবে সামনে এসেছে। কোন কোন ভাবে সে ব্যক্তি শ্রেণিগত পরিচয় বহন করে চলছে। এই শ্রেণিগয পরিচয় সে পরিমণ্ডল রচনা করেছে তার মধ্যে বিকশিত হয়েছে চরিত্রগুলির আত্মস্বরূপ। ছোট ছোট গল্পরূপের মধ্যেও কেমন সুন্দরভাবে চরিত্রের বিকাশ হয়েছে তা লক্ষ্যণীয়, শ্রমিক, কৃষক, ডাক্তার, সাধারণ চাকুরীজীবী, ভিখিরি, অসহায়া নারী, যে কোন চরিত্র এক একটি সংকটের রূপকে প্রকাশ করেছে, সর্বত্র যেন ব্যক্তিচরিত্রের অবস্থান একটা দ্বান্দ্বিকতাকে প্রকট করেছে। সমাজ কি কেন, সেখানে সেই ব্যক্তির মূল্য কতটা, কিভাবে সে বাঁচছে, ভালোভাবে বাঁচার অধিকার তার আছে কিনা, এসকল মৌলিক প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে প্রতিটি গল্পে।

ব্যক্তির অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত এ সকল প্রশ্ন তাই গল্পগুলোর

আকার আকৃতি ও প্রকৃতিকে পরিবর্তন করেছে। লেখক এই গল্পগুলোকে নিয়ে, বিষয়বস্তু ও প্রকরণকে নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা করেছেন তা স্পষ্ট। 'ইনটারভিউ' গল্পটি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি বিশেষ রূপ, ছকভাঙা ভাবনার মধ্যে দিয়ে একটা ভিন্ন পরিবেশ রচনা করা হয়েছে, এই পরিবেশে চাকুরিপ্রাপ্তি, খাওয়ার অধিকার, সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন একাকার হয়ে গিয়েছে। ছোট গল্প অনুগল্প ইত্যাদির সংজ্ঞার বাইরে বেরিয়ে 'ইনটারভিউ' হয়ে উঠেছে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত একটি পরিপূর্ণ জিজ্ঞাসা।

অনুগল্প সংকলকনটি একটি দীর্ঘ সময়পটের কথা। ১৯৬৯-২০১৯ সাল বহু ঘটনা, বহু সামাজিক উত্থান-পতন, অনেক আন্দোলন, অনেক পরিবর্তন এই সময়পর্বে ঘটে গিয়েছে। সারা পৃথিবীজুড়ে নানান পরিবর্তন ঘটেছে, লেখকের মনের পটে এ সকল পরিবর্তন বিচিত্র আলোড়ন তুলেছে, তিনি সযত্নে ব্যক্তিচরিত্রের ওপর সেই পরিবর্তনের রূপগুলিকে অবলোকন করেছেন, গল্পগুলির মধ্যে সেই রূপচিত্রই ফুটে উঠেছে।

এতকিছু পরিবর্তন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংকটকে পেরিয়ে মানুষ চলেছে তার দাবি নিয়ে—খাদ্যের দাবি, সুন্দর পৃথিবী রচনার দাবি। লেখক এটিই দেখিয়েছেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন এই পথ চলাই প্রকৃত ইতিহাস। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন পরিবর্তনের মধ্যেও মানুষকেই সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিতে হয় বেঁচে থাকার জন্য, উত্তরণের জন্য।

অনুগল্পের মধ্যে ছোট ছোট পটে এইসব ভাবনাকে এঁকে দিয়েছেন শ্রীসমীর রক্ষিত। পাঠক হিসাবে আমরা এই ভাবনার গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পৌঁছাতে চাই, লেখকের জীবনবোধকে জানার জন্য নিজেদের অবস্থানকে বোঝার জন্য।

গ্রন্থনাম—সমীর রক্ষিতের অনুগল্প/প্রকাশক—দিয়া পাবলিকেশন/
প্রকাশ কাল—বইমেলা ২০২০/মূল্য—৭৫ টাকা মাত্র

শতবর্ষে রুশ বিপ্লব : পাঠ প্রতিক্রিয়া

অনিকেত মহাপাত্র

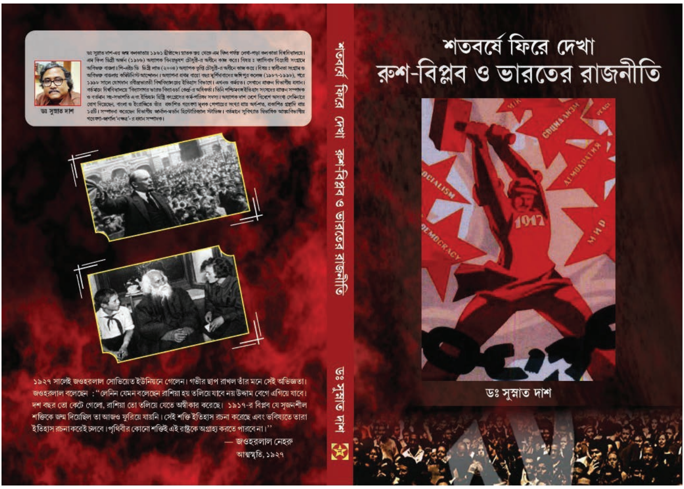

মাঝে মাঝে ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে এমনও হওয়া সম্ভব। বোধহয় মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বৃহৎ ও স্মরণীয় ‘খোদার ওপর খোদদারি’ হল রুশবিপ্লব পরবর্তী সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো নির্মাণ। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব-সঞ্জাত সমাজ ব্যবস্থা দুনিয়ার সামনে একটি দৃষ্টান্ত রূপে প্রতিভাত হল। আবার এই ব্যবস্থার বিয়োগন্তক পরিণতিও আমরা লক্ষ্য করেছি গত শতাব্দীর শেষ দশকে। সব মিলিয়ে এক নস্টালজিয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাশিয়ার চিঠিতে’ আমরা বাঙালির সোভিয়েত রাশিয়া পরিচয়ের ও প্রীতির এক সার্বজনিন এবং নিরপেক্ষ রূপ দেখতে পাই। তবে রবীন্দ্রনাথ ভাবালু বাঙালির মতো ওপর ওপর দেখার পন্থী নন, সোভিয়েত রাশিয়ার মর্মদেশ তার সামনে উদঘাটিত হয়েছিল। এই কথাটির ব্যাপারে অর্থাৎ এই উদঘাটনের বিষয়ে উপস্থাপিত বক্তব্যে কেউ অতিরঞ্জন, অভিষেকের অস্তিত্ব খুঁজে পেতেই পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত উপলব্ধির মূলে কবে কোন যুক্তি-তর্ক কুঠারাঘাত করতে পেরেছে।

এই এতোগুলি কথা যে প্রসঙ্গে অবতারণা করা হল, সেটির কারণ হলো একটি গ্রন্থ পাঠ। ইতিহাসবিদ ও অধ্যাপক সুস্নাত দাশের

'শতবর্ষে ফিরে দেখা : রুশ বিপ্লব ও ভারতের রাজনীতি' গ্রন্থটির পাঠ প্রতিক্রিয়া। ২০১৮-এর ফেব্রুয়াতিতে নক্ষত্র প্রকাশন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটি শতবর্ষ অতিক্রম করা রুশ বিপ্লবকে আবার মনে করায়, ভাবতে বাধ্য করে। এই বাধ্যতা ভাল লাগার। কলেজস্ট্রিট পাড়ায় কলেজ স্কোয়ারের উলটোদিকে 'মনীষা' নামের প্রকাশনায় বা এন বি এ গেলে – সেখানে রাদুগা বা প্রগতি প্রকাশনার পুরনো বইগুলি পড়তে পড়তে বড়ই মনে পড়ে সোভিয়েত রাশিয়ার কথা, গন্ধ পাওয়া যায় সেই সময়ের। অধ্যাপক সুস্নাত দাশের গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। সব মিলিয়ে চৌদ্দটি প্রবন্ধ এবং একটি পরিশিষ্টের (রুশ বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত কাল পঞ্জী) সমবায়ে গ্রন্থটি উপস্থাপিত। লেখকের আর একটি লেখাও স্থান পেতে পারত গ্রন্থে যে সমালোচনা, প্রবন্ধটি নিয়ে স্রষ্টা বেশ স্মৃতিকাতর। লেখকের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একটি গ্রন্থ পর্যালোচনা ই এইচ কারের 'বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়া' নিয়ে – সেটি নিরুদ্দিষ্ট হওয়াই আর এই গ্রন্থে সংযুক্ত হতে পারেনি। যদিও লেখক এই অনুপস্থিত লেখাটি মূল্যায়ন করতে গিয়ে তুলনামূলক ভাবে 'কাঁচা কাজ' বললেও – নিজের টান গোপন করেননি।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধ "রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ: কার্ল মার্কস ও লেনিনের তাত্ত্বিক প্রয়োগ।" প্রবন্ধটি গ্রন্থটির নিজস্ব অভিমুখ স্থির করে দেবার কাজটি করে দেয়। যদিও এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে লেখা নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার আর্জি আবদারে লেখা হয়েছে গ্রন্থের বেশ কিছু প্রবন্ধ। তবু পাঠক প্রথমে দিশা পেয়ে যেতে পারেন। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাশিয়া বিষয়ক অভিজ্ঞতার লিখন ভারতীয় মানসপটে সোভিয়েত রাশিয়ার চিত্রটিকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি পত্রের উল্লেখ করেছেন লেখক তার এই প্রবন্ধে। 'সোভিয়েত রাশিয়ার নাম কথা এদেশে অপরাধ বিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষে না করলেও থাকতে পারিনে। বিশাল রাজ্যের অন্ন সংস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, রোগ নিবারণ কি অসাধারণ উদ্যম নৈপুণ্য ও যত্নের সঙ্গে সেখানে নির্বাহ করা হচ্ছে তার বিচার করে মনে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ঈর্ষা না হয়ে থাকতে পারে না। তার প্রধান কারণ সোভিয়েত রাশিয়া একটি অখন্ড সজীব কলেবর।' ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) Imperialism : The Highest Stage of Capitalism অর্থাৎ "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের

সর্বোচ্চ পর্যায়'' নামক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকার (১৯১৬) থেকে তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত নির্মাণের সমিধ আহরণ করেছেন। উক্ত পুস্তিকায় থাকা সাম্রাজ্যবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এই সময়ের বিশ্বে বিশেষভাবে দৃষ্টমান। দেখা যাচ্ছে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মার্কসীয় ঘরানার তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যা মার্কসবাদের পরিবর্ধিত ভাষ্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যথা রুডলফ হিলফরডিং (১৮৭৭-১৯৪১)-এর 'Finance Capital' বা বিত্ত পুঁজি। এছাড়া ছিল সাম্রাজ্যবাদ সম্পরকে Hobson-এর ভাষ্য।

পরবর্তী প্রবন্ধে সোভিয়েত বলশেভিক বিপ্লবের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটে রাশিয়ায় মার্কসবাদী চিন্তনের সূচনা, চর্চা, বিস্তার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্লেখানভ প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি থেকে শুরু করে লেনিনের 'League of Struggle for the Emancipation of the Working Class'-এর প্রসঙ্গ আলোকিত হয়েছে। তাছাড়া SDLP বা Social Democratic Labour Party; ছদ্মবেশী মার্কসবাদী বা 'আইনী মার্কসবাদী' গোষ্ঠীর কথা রয়েছে। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের হত্যাকাণ্ডের পর যে নারদনিক বিপ্লবীদের নির্মম ভাবে দমন করা হয়েছিল, তাদেরই উত্তরসূরি 'Socialist Revolutionary (SR) Group' গুলি মার্কসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সহযোগিতা মূলক সহাবস্থানে ছিল। Zemstvoist Liberal-রাও সক্রিয় ছিল আবার মার্কসবাদের মূল নীতির পরিপন্থী মনোভাব পোষণকারী কিছু Liberal Economist দের গোষ্ঠী তাদের মতপ্রকাশ করছিল প্রতিনিয়ত। এই গোষ্ঠী মনে করত যে শ্রমিকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ অপ্রয়োজনীয়। আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে বলশেভিকরা এই অর্থ নীতিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

'রুশ সমাজতান্ত্রিক বা বলশেভিক বিপ্লবে ফিরে দেখা কমরেড লেনিনের ভূমিকা; 'দুনিয়া কাঁপানো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কি অলীক? বিপ্লব পরবর্তী সোভিয়েত রাশিয়ায় জনশিক্ষা আন্দোলন ও রবীন্দ্র দর্শন' সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং ভারতে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামী উত্থান' নভেম্বর বিপ্লব, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা' 'মীরাট কমিউনিস্ট যড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯-৩৩) : প্রেক্ষিত ও পর্যালোচনা'; জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র বিপ্লব থেকে মার্কসবাদ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট অধ্যায়'; 'স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্ট কংগ্রেস সম্পর্কের সাতকাহান'; সুভাষচন্দ্র বসুর

চিন্তাধারায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব'; 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বাংলা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের বিলম্বিত প্রভাব', 'ম্যাক্সিম গোরকির মা'; শতবর্ষে ফিরে দেখা'; 'রুশ বিপ্লবের প্রভাবে আলোকিত তিন মার্কসবাদী ভারতীয় মনস্বী'; 'পরিশিষ্ট রুশ বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জী– এই সব রচনার দ্বারা গ্রন্থটি ঋদ্ধ।

ম্যাক্সিম গোরকির লেখা 'মা' কে নিয়ে লেখাটি গোরকির 'মা' শতবর্ষে ফিরে দেখা ভিন্ন ধরনের। এই উপন্যাস নিয়ে ভারতে চর্চা ও অনুবাদের চালচিত্র পাওয়া যায় প্রবন্ধে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রগতিশীল লেখা 'পুঁজির বৃদ্ধি' আর অবশ্যই লেনিনের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ ''সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়'। মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাব লেনিন ও তার চিন্তনকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা নিয়ে কয়েকটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ রয়েছে যা প্রবন্ধটি সহ গ্রন্থটিরও জোরের জায়গা। তবে গ্রন্থ লেখক সীমাবদ্ধতার প্রতিও উদাসীন নন। তিনি লিখছেন, ''কমিউনিস্ট ইস্তাহারকে কখনই মার্কসের রাজনৈতিক দলের স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মসূচী হিসাবে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের আত্মপ্রকাশ। ইস্তাহারের মূল জোরটি পড়েছে শ্রেণী সংগ্রাম এবং পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধনের উপর, যা ঐতিহাসিক অগ্রগতির পথে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে এভাবে ইতিহাস বোধ এবং রাজনৈতিক বস্তুবাদের মধ্যে এক অসাধারণ সংযোগ ঘটেছে। রাজনীতি ও ইতিহাস মিশে গেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত : বাস্তবে কল্পিত ঘটনাক্রমের সঙ্গে তা মেলে না। মার্কস যে 'Spectre of Communism' -এর কথা বলেছিলেন তা ফলেনি। ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। লীগ ভেঙে গিয়েছিল এবং মার্কস ও এঙ্গেলস ব্রাসেলস থেকে বিতাড়িত হয়ে লন্ডনে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলস-এর পরিকল্পিত কর্মসূচী ও পু পুঁজিবাদের অগ্রগতির মাঝে একটা ব্যবধান থেকে গিয়েছিল। পরবর্তী অংশ ''লেনিনের কি করিতে হইবে এবং তারপর'' এ প্রাবন্ধিক আলোচনাটি অনবদ্য ভঙ্গিতে গুটিয়ে এনে সংহত পটনির্মাণ করেছেন অব্যবহিত পরবর্তী আলোচনাগুলি। যারা মার্কসবাদ নিয়ে অল্প বিস্তারচর্চা করেন তাঁরা জানে " State of Revolution অর্থাৎ রাষ্ট্র ও বিপ্লব গ্রন্থের গুরুত্ব কতোটা মার্কসীয় এবং তার পরিবর্ধিত দার্শনিক প্রেক্ষিতে। আর এই গ্রন্থের রচয়িতা বলা বাহুল্য ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। সত্যিই ইতিহাসের এক বিরল 'প্যারাডক্স এই যে – ট্রটস্কি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন – ''লেনিন

যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে মার্কসের সিংহসদৃশ মস্তিষ্কটি প্রথম গিলোটিনে যাবে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে করা এই ভবিষ্যৎবাণী কতদূর সত্যি হয়েছিল ইতিহাসের পটভূমিকায় তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই যাত্রায় লেখক এগিয়েছেন বিপ্লব পরবর্তী সময়ের দিকে। পাঠক পেতে পারবেন বিবিধ তথ্যের হদিশ এবং সেগুলি নিয়ে সুচারু বিশ্লেষণ।

বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁর কেশরী পত্রিকায় জানিয়েছিলেন যে লেনিন যদি সফল হন, তাহলে তা হবে সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত জয়লাভ। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারির ওই সংখ্যায় তিলক লেনিন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আবার ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারির সংখ্যায় শ্রমিক শ্রেণির একটি বৃহৎ ধর্মঘট সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছিল যে ধর্মঘটের কারণ নতুন সময়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রাশিয়ার ব্যাপারে সর্বাধিক উৎসাহিত করেন যে দুজন – তারা হলেন প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যজন হলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই আলোচনাটি শেষ করা যেতে পারে একটি কবিতা দিয়ে।

শিবরাম চক্রবর্তী 'আত্মশক্তি পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯২৮ লিখেছিলেন। প্রবন্ধে কবিতাটির উল্লেখ রয়েছে) – "যারা পা ভাঙে বোঝা বয়ে সোজা হয়ে জনতার ভিড়ে ঘর্মাক্ত শরীরে, চাষ করি শ্রাবণে শিশিরে লাঙলের ফালে যারা ভরি তোলে এই ধরিত্রীর সোনার সঞ্চয়।

মৃত্যুকে ঠেকায় রাখে – বীর যারা এই পৃথিবীর আপনারে নিত্য করি ক্ষয়। মানবের নিত্য পরিত্রাতা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা যারা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দানে তবু সর্বহারা বসে নিত্য – দুর্ভিক্ষের তীরে আলোকের উৎস হয়ে রহিল তিমিরে বঞ্চিত মহান তাহাদের সবার সামনে।'

অধ্যাপক সুস্নাত দাশের এই গ্রন্থটি ইতিহাস অন্বেষী, সাহিত্য প্রেমীসহ সাধারণ পাঠকেরও পাঠ তৃষ্ণা নিবারণ করতে সক্ষম – যদি তা চাতকের-ই মতো হয়, তবুও মন্দ কী।

ড. সুস্নাত দাশ।। শতবর্ষে ফিরে দেখা রুশ বিপ্লব ও ভারতের রাজনীতি।। নক্ষত্র প্রকাশন।। কলকাতা-৭০০১০১।। মূল্য : ৩০০ টাকা।।

NANDAN VOL. 55 NO. 4-5 JUNE 2020 REGD. NO KOL RMS/358/2020
RNI-8549/63

আধুনিক চীনের ইতিহাস বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ
'স্বর্গের নীচে মহাবিশৃঙ্খলা'
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
৬০.০০

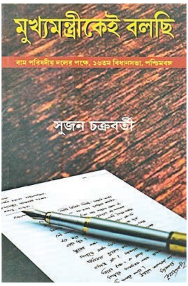

রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠির সংকলন
মুখ্যমন্ত্রীকেই বলছি
ড. সুজন চক্রবর্তী
৫০.০০

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন
আদি শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ
ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ
৫০.০০

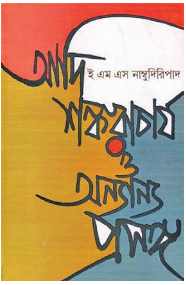

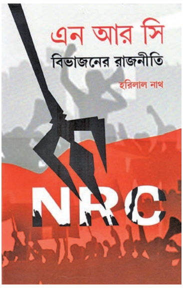

এন আর সি কি? এরফলে সমাজজীবনে অস্থিরতার কারণ বুঝতে
এন আর সি বিভাজনের রাজনীতি
হরিলাল নাথ
দাম : ১৫ টাকা

রক্তের শপথ জালিয়ানওয়ালাবাগ
কৃশানু ভট্টাচার্য ৭৫.০০

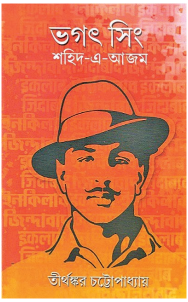

মহান বিপ্লবীর জীবন ও আদর্শ
ভগৎ সিং শহীদ-এ-আজম্
তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৭০.০০

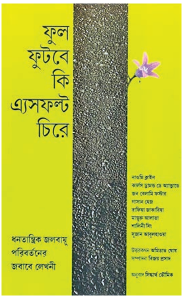

ধনতন্ত্রের কবল থেকে পরিবেশকে উদ্ধারের সংগ্রাম। বিশ্বের বিশিষ্ট লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ
ফুল ফুটবে কি অ্যাসফল্ট চিরে
(ধনতান্ত্রিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লেখনী)
সম্পাদনা : **বিজয় প্রসাদ**
৬০.০০

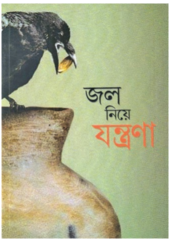

জল সংকটের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বুঝতে
জল নিয়ে যন্ত্রণা
(প্রবন্ধ সংকলন) ৬০.০০

দেবীপ্রসাদ : সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন ভাবনা
শ্যামল চক্রবর্তী
৩৬০.০০

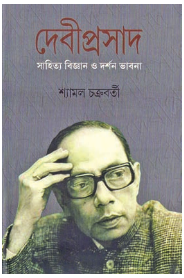

এন বি এ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ (২২৪১-৬৪৩২)
● ২, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২ (২২৪১-৩৩৭৬)
শাখা : বিধাননগর, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
e-mail : nba.pvltd@gmail.com
● Fax : 23342769
Web : nationalbookagency.com